নির্বাচিত প্রবন্ধ

# এই মহান উম্মত কী গাজার ক্ষুধার্ত মানুষদের জন্য ঔষধ, খাদ্য এবং পানির ফোঁটা পৌঁছে দিতে পারে না!?


নাওয়ায়ে গজওয়াতুল হিন্দ

উপমহাদেশ ও বিশ্বজাহানী হিন্দের বিজয়ের দিকে আহ্বানকারী

আগস্ট ২০২৫ ইংরেজি | সফর ১৪৪৭ হিজরি

# নাওয়ায়ে গজওয়াতুল হিন্দ

উপমহাদেশ ও বিশ্বব্যাপী দ্বীনের বিজয়ের দিকে আহ্বানকারী

আগস্ট ২০২৫ ইংরেজি | সফর ১৪৪৭ হিজরী

নাওয়ায়ে গজওয়াতুল হিন্দ
উপমহাদেশ ও বিশ্বব্যাপী দ্বীনের বিজয়ের দিকে আহ্বানকারী

**আগস্ট ২০২৫ ইংরেজি | সফর ১৪৪৭ হিজরী**

- **অনুবাদ :** আল হিকমাহ অনুবাদ টিম
- **প্রথম প্রকাশ**
  রবিউস সানী ১৪৪৭ হিজরি
  সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইংরেজি
- **স্বত্ব :** সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত
- **প্রকাশক : আল হিকমাহ মিডিয়া** (আল কায়েদা উপমহাদেশ, বাংলাদেশ হালাকা)
- **চ্যানেল লিংক:**
  https://talk.gnews.to/channel/al-hikmah-media
  https://chirpwire.net/alhikmahmedia

**নোট:** এই ম্যাগাজিনটি 'আল কায়েদা উপমহাদেশ শাখা (AQS)' এর অফিসিয়াল ম্যাগাজিন 'নাওয়ায়ে গাজওয়াতুল হিন্দ' -এর 'আগস্ট ২০২৫ ইংরেজি মোতাবেক সফর ১৪৪৭ হিজরী সংখ্যা'র নির্বাচিত প্রবন্ধসমূহের বাংলা অনুবাদ।

## স্বত্ব

এই ম্যাগাজিনের স্বত্ব সকল মুসলিমের জন্য সংরক্ষিত। পুরো ম্যাগাজিন, বা কিছু অংশ অনলাইনে (পিডিএফ, ডক অথবা ইপাব সহ যে কোন উপায়ে) এবং অফলাইনে (প্রিন্ট অথবা ফটোকপি ইত্যাদি যে কোন উপায়ে) প্রকাশ করা, সংরক্ষণ করা অথবা বিক্রি করার অনুমতি রয়েছে। আমাদের অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে শর্ত হল, কোন অবস্থাতেই ম্যাগাজিনে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন করা যাবে না।

- **কর্তৃপক্**

# সূচিপত্র


সম্পাদকীয় ..... ১০

কলিজার রক্ত দিয়ে এ দাগ মুছে ফেলার আকাঙ্ক্ষা আজ হৃদয়ে জাগছে..... ১১

দারুল ইফতা ..... ২২

গাজার সাম্প্রতিক যুদ্ধ ও মুসলমানদের উপর জিহাদের ফরয হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া ..... ২৩

ফিকির ও মানহাজ ..... ৩৫

জাতিরাষ্ট্রের ইসলামীকরণ: স্বপ্ন ও বাস্তবতা ..... ৩৬

আধুনিক রাষ্ট্রের (State) বৈশিষ্ট্যসমূহ ..... ৩৯

ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historicity) ..... ৩৯

সার্বভৌমত্বের ধারণা (Sovereignty) ..... ৪১

আইন প্রণয়ন ও সহিংসতা (Legislation & Violence) ..... ৪৭

আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Bureaucratic Management) ..... ৪৯

নাগরিকত্ব (Citizenship) ..... ৫৩

শেষ কথা ..... ৫৫

কাফেরদের অর্থনৈতিক বয়কট | চতুর্থ পর্ব ..... ৫৯

বয়কটের কর্মপদ্ধতি ..... ৬০

অগ্রাধিকার নির্ধারণ ..... ৬৩

ইহুদীবাদীদের নিয়ন্ত্রিত বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা ..... ৬৫

একটি সাধারণ উদাহরণ ..... ৬৭

সোহবতে বা-আহলে দিল ..... ৬৯

উস্তাদ ফারুকের সাথে | একত্রিশতম আসর ..... ৭০
তুফানুল আকসা .....৭৯
আল্লাহর পথে এগিয়ে চলো — কিসের অপেক্ষা? .....৮০
গাজাবাসীর জন্য জরুরি সহায়তার আহ্বান .....৮৬
ভূমিকা ..... ৮৭
লজ্জাজনক নীরবতা ..... ৮৭
মিশরবাসীর প্রতি আহ্বান .....৮৮
সীমান্ত পার হওয়ার অপরিহার্যতা ..... ৮৯
প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি বার্তা ..... ৮৯
ধনীদের প্রতি সতর্কবার্তা .....৯০
ফিলিস্তিনি সাংবাদিক আনাস আশ-শরীফের শেষ অসিয়ত .....৯২
প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি – মরক্কো ৯৭
মরক্কো (আল-মাগরিব) .....৯৭
প্রেক্ষাপট .....৯৭
সুলতান মুহাম্মাদ পঞ্চম (১৯২৭–১৯৬১) .....৯৯
শাহ হাসান দ্বিতীয় (১৯৬১ – ১৯৯৯) .....১০১
অপারেশন ইয়াখিন .....১০১
অস্ত্র ক্রয়, সামরিক প্রশিক্ষণ ও গোয়েন্দা সহযোগিতা..... ১০৩
আরব লীগের গোপন সম্মেলন ও শাহ হাসান সানীর বিশ্বাসঘাতকতা ....১০৪
১৯৭৩ সালের আরব–ইসরাঈল যুদ্ধ (ইয়ম কিপুর যুদ্ধ) এ মরক্কোর অংশগ্রহণ.....১০৫
কুদস কমিটির প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব .....১০৬
মিশর-ইসরাঈল সম্পর্ক স্থাপনে মরক্কোর ভূমিকা .....১০৭

মরক্কো সফরে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী .....১০৯
অসলো চুক্তির পর আইজাক রবিনের মরক্কো সফর..... ১১০
মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন (MENA Summit) ..... ১১৩
মরক্কো ও ইসরাঈলের মধ্যে আংশিক কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা .....১১৪
রাজা মুহাম্মাদ ষষ্ঠ (১৯৯৯–বর্তমান) ..... ১১৫
দ্বিতীয় ইন্তিফাদা ও সম্পর্ক ছিন্নকরণ ..... ১১৫
ইরান ও হিজবুল্লাহ বিরোধী সহযোগিতা ..... ১১৬
ইসরাঈল–মরক্কো 'নরমালাইজেশন' .....১১৭
'তুফান আল-আকসার' পর মরক্কো–ইসরাঈল সম্পর্ক ..... ১২০
গাজা যুদ্ধ চলাকালে সরাসরি সহায়তা.....১২১
উপসংহার .....১২২
আমার হেঁচকি কোনো দিন কোনো মুক্তপুরুষকে দূরদেশ থেকে এনে দিতে পারল না! ..... ১২৪
কোনো গুণ্ডা নিজের জোরে গুণ্ডা হয় না ..... ১২৭
গাজা: নীরবতা মানে অপরাধে শরীক হওয়া! ..... ১৩২
পাকিস্তানের লক্ষ্য... ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন .....১৩৬
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর' নামে গড়া দেশের দারুল-আমানে নিগৃহীত জাতির কন্যারা .....১৩৭
কাশানা কেলেঙ্কারি ও দারুল-আমানের বাস্তব চিত্র ..... ১৩৮
দারুল-আমান সম্পর্কিত আদালতের রায়.....১৩৯
পাকিস্তানে দারুল-আমান ও শেল্টার হোমের সংখ্যা.....১৪০
দারুল-আমানে কাদের রাখা হয়? .....১৪১
আশ্রয়ের শর্তাবলি ..... ১৪২

সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক ..... ১৪৩
ওঠো হে পাকিস্তান! ডাকছে তোমার মেয়ে ..... ১৪৬
সামরিক অভিজাতদের জায়নবাদী চরিত্র: পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গাজার পক্ষে দাঁড়ায় না কেন? ..... ১৫০
কাশ্মীর... ..... ১৫৮
গাযওয়াতুল হিন্দের দরজা ..... ১৫৮
তোমার নেতৃত্বের কাছে প্রশ্ন রাখো! ..... ১৫৯
পুরো হিন্দ আমাদের ..... ১৬৮
বাহ্যিক যুদ্ধের অন্তর্নিহিত কৌশল | দ্বিতীয় কিস্তি ..... ১৬৯
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ..... ১৭০
আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেপোলিয়নের ছায়া ..... ১৭২
পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়, গোপন সংগঠন ও বৈশ্বিক শিক্ষানীতি ..... ১৭৭
প্রথমত, অর্থায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ (Control with Funding) ..... ১৭৮
দ্বিতীয়ত, নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার (Policy Manipulation) ..... ১৭৮
তৃতীয়ত, পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈশ্বিক মানদণ্ডে পরিণত করা (Global Academic Benchmark) ..... ১৭৯
ফলাফল ও সারসংক্ষেপ ..... ১৭৯
প্রস্তাবিত পাঠ্য ..... ১৮০
শাম তোমাদের কাছে আমানত ..... ১৮১
শামের জিহাদের ভবিষ্যৎ | অংশ–২, দ্বিতীয় কিস্তি ..... ১৮২
দৃষ্টিভঙ্গি ..... ১৯৭
মুমিনের প্রজ্ঞা ..... ১৯৮
হালকায়ে মুজাহিদ ..... ২০৬

নতুন সাথিদের জন্য হিজরত ও জিহাদের প্রস্তুতি ..... ২০৭
কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা:..... ২০৮
সামরিক প্রশিক্ষণ.....২১২
নিরাপত্তা (সিকিউরিটি) | দ্বিতীয় পর্ব..... ২১৩
নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে সাহাবীদের গোপনীয়তা রক্ষার প্রশিক্ষণ ..... ২১৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোলাফায়ে রাশেদীনের শিক্ষা:..... ২১৮
উপদেশ:..... ২১৯

# সম্পাদকীয়

# কলিজার রক্ত দিয়ে এ দাগ মুছে ফেলার আকাঙ্ক্ষা আজ হৃদয়ে জাগছে

আমরা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা এক ঘোর উদাসীনতা, এক মহা বিস্মৃতি আর এক বিরাট বিশ্বাসঘাতকতার দৃশ্য অবলোকন করছি। কত কথা যে মনে আসে, কিন্তু কলম ও জিহ্বা সেগুলো প্রকাশ করতে অক্ষম। মনে পড়ে যায় শায়খ মাহমুদ হাসনাতের কথা—যিনি একদিন খুতবার জন্য মিম্বরে দাঁড়ালেন, কিন্তু বললেন কেবল এইটুকু: "যে উম্মতকে গাজার মানুষের গণহত্যা ও লাশের সারি জাগিয়ে তুলতে পারে না, আমার বক্তব্য ও খুতবা তাদের উপর কী প্রভাব ফেলবে?"—এবং সঙ্গে সঙ্গেই নেমে গেলেন।

১৮ জুলাইয়ের সেই রক্ত ঝরা আহ্বান আজও মনে প্রতিধ্বনিত হয়—মুজাহিদ নেতা আবু উবাইদার আহ্বান। তিনি বলেছিলেন, কী ভয়াবহ অবস্থার শিকার হয়েছে এই মহান উম্মত! এমনকি গাজার মানুষদের জন্য ঔষধ, পানির ফোঁটা আর অন্নদানও তারা পৌঁছে দিতে সক্ষম নয়। আবু উবাইদা এই উম্মতকে ডেকেছিলেন—জনসাধারণ ও অভিজাত শ্রেণিকে, আলেম ও শাসকদের, সৈনিক ও মুজাহিদ দাবিদারদের, কবি-সাহিত্যিক-সংবাদ কর্মীদের, দানশীল ও ধনী ব্যবসায়ীদের—সবাইকে। কিন্তু হায়! তার ডাকে কেউ সাড়া দেয়নি, বরং নীরবতা ক্রমশ আরও দীর্ঘতর, আরও গভীরতর হয়ে উঠল।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের মনে মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে থাকে—জীবনের কিছু মেহনত, কিছু কিছু কষ্ট ক্লেশ হয়তো আখিরাতের লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু গাজার প্রতিটি মানুষ স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছে: "তোমরা যে মুহাম্মাদ ﷺ রাসূলুল্লাহর কালিমা পাঠ করো, কিয়ামতের দিন আমরা তোমাদের সেই মুহাম্মাদ ﷺ-এর সামনে টেনে নিয়ে যাব। আজ এখানেই আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করছি। আর সেদিন আমরা তোমাদের গলা চেপে ধরে কাওসারের সাকির (আলাইহি আলফু সালাতিন ওয়া সালাম) সামনে তোমাদের লাঞ্ছিত করব।"

এই কথাগুলো লিখতে লিখতে আমরা বারবার ভাবলাম—কঠিন কোনো শব্দ যেন কলম থেকে না বের হয়। কিন্তু গাজার নারী-শিশু ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবস্থা, এবং নিরাশ্রয় পুরুষদের অবস্থা যখন চোখে ভেসে ওঠে—তখন সত্যি বলছি, এ কঠিন শব্দও নরম মনে হয়।

উম্মতের সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত, পর্দানশীন কন্যারা যখন ভিক্ষা করতে থাকে; তাদের ইজ্জত লুট হয়ে যায়; স্বামীহারা হয়, সংসার উজাড় হয়ে যায়; যে শিশুরা স্নেহ-আদরে বেড়ে উঠেছিল, তারা যখন ভিক্ষারত হয়ে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, অমুসলিম সাহায্যদাতাদের হাত চুম্বন করে কৃতজ্ঞতা জানায়; ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কঙ্কালসার বৃদ্ধরা যখন দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়—সেখানেই মৃত্যু ঘটে তাদের, অথচ আমরা তখন আরামের কক্ষে শুয়ে থাকি, জীবনের চাকচিক্য, আলো আর আনন্দের স্রোতে ভেসে থাকি—এই সবের পর গাজার মানুষ কি এই সেরা উম্মতকে নিকৃষ্ট উম্মত বলে অভিহিত করবে না?

যখন আমরা আন্দালুস (গ্রানাডা)-এর পতনের ইতিহাস পড়ি, তখন তার শাসকদের অভিশাপ ও লাঞ্ছনায় ভরা কাহিনি পড়তে পড়তে বারবার

ভেবেছি—সেই সময়ে বাকিরা কী ধরনের মানুষ ছিল, যারা এ সবকিছু নীরবে সহ্য করে নিয়েছিল! ইতিহাসে তো কয়েকটি চরিত্রকে জয়ী বা কাপুরুষ বলে চিহ্নিত করা হয়। বলা হয়, আবু আব্দুল্লাহ মন্দ শাসক ছিল, আর সালাহুদ্দীন ছিলেন উত্তম নায়ক। কিন্তু গভীর অধ্যয়ন বলে দেয়—আবু আব্দুল্লাহ কিংবা সালাহুদ্দীন দুজনেই মূলত এক জাতির বিবেকের প্রতিচ্ছবি। যে জাতির বিবেক মৃত, হৃদয় থেকে গায়রত ও জিহাদের অনুভূতি মুছে গেছে—তাদের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে আবু আব্দুল্লাহ। আর যে জাতির বিবেক সজাগ, হৃদয় ভরে থাকে গায়রত ও জিহাদে—তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সালাহুদ্দীনের মতো রাজা দান করেন।

অবশ্য এও সত্য—প্রত্যেক সজীব বিবেকবান ও মুজাহিদ সমাজ সবসময় বিজয়ী হয় না। তারা কখনো সিরাজউদ্দৌলা হয়, কখনো টিপু সুলতান হয়—মৃত্যুকে বরণ করে নেয়, ইতিহাসে 'পরাজিত বিজেতা' নামে পরিচিত হয়।

এ কি সত্য নয় যে গাজা একদিন জয়লাভ করবেই, আল্লাহর কালিমা উঁচু হবেই? কিন্তু যে প্রজন্ম সেই কাজ সম্পাদন করবে, তারা আগামীকাল আমাদেরকে তথা আজকের প্রজন্মকে অভিশাপ দেবে। তারা বলবে: "দুইশত কোটির উম্মত ছিল, বিদ্যা-শিল্পে সমৃদ্ধ এবং ধনসম্পদে সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী লোকও ছিল। অথচ আমাদের পূর্বসূরিরা কী ভীষণ খারাপ ছিল! উম্মত তাদের চোখের সামনে নিহত হচ্ছিলো, কিন্তু তারা নিজ নিজ আরামের কক্ষে ডুবে ছিল ভোগ-বিলাসে।" হায়, কী বেদনাদায়ক!

যদি হৃদয়ে এখনো সামান্যতম গৌরব ও আত্মমর্যাদার স্ফুলিঙ্গ অবশিষ্ট থাকে, তবে আসুন, নিম্নের কয়েকটি মূল বিষয়ের মাধ্যমে নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিই।

- প্রথমত, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ, আল্লাহর বাণীকে উচ্চে তুলে ধরা, নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়ানো এবং বিশেষ করে পবিত্র ভূমির মুক্তি সাধনের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে জিহাদে অংশ নেয়া ও প্রস্তুত হওয়া প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরযে আইন (আবশ্যক দায়িত্ব)। এ দায়িত্ব থেকে কারো মুক্তি নেই; কেবল তারা ব্যতীত, যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপারগ। মনে রাখবেন, প্রাথমিক যুগের সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনদের যুগে জিহাদে বের হওয়া না হওয়ার কোনো প্রশ্নই ছিল না। যে উম্মতের নবী ﷺ-এর জীবন ছিল নিরন্তর জিহাদের প্রতীক—যিনি বার্ধক্যকালেও যুদ্ধের ঘোড়া ও উটের পিঠে আরোহণ করেছেন। যিনি দেহে বর্ম ও মাথায় লোহার টুপি পরিধান করেছেন। যিনি হাতে জুলফিকার ও মুহান্নাদ তরবারি ধারণ করেছেন—সেই নবীর উম্মতের লোকদেরকে আজ ফকিহদের গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেখিয়ে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করা সত্যিই বিস্ময়কর। বাস্তবতা হলো, এই উম্মত হলো জিহাদি উম্মত; যদি এ উম্মত জিহাদ থেকে বিরত থাকে, তবে তাদের আর কী বাকি থাকে?

  “যে সংগ্রামে অংশ নেয় না, সে হয় পিছিয়ে থাকা ব্যক্তি, অথবা দ্বিমুখী, কিংবা উদাসীন, বা বৈধ অজুহাতপ্রাপ্ত। এর বাইরে অন্য কোনো শ্রেণি নেই।”

  তাহলে আগামীকাল নয়, আজই প্রস্তুত হোন—কোনো নাম কুড়ানোর জন্য নয়, বরং সেই অমঙ্গল থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, যা গাজার মজলুমদের আহাজারি ও অভিশাপের কারণে আমাদের উপর বজ্রপাতের মতো নেমে আসতে পারে।

- দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলমানদের সামনে দুটি পথ ছাড়া আর কিছু নেই—হিজরত অথবা জিহাদ। হয় তারা মুমিনদের দেশে হিজরত করবে (এবং সেখানে জিহাদি কাজে অংশগ্রহণ করবে) অথবা পশ্চিমা দেশগুলিতে বসবাস করে তারা তাদের গাড়ি, ট্রাক, ছুরি, বাসা বাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার ইত্যাদি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ইহুদী শত্রুদের উপর আক্রমণ করবে।[1] এর বাইরে সেখানে বসবাসের কোনো যুক্তি অবশিষ্ট থাকে না।[2]
- পশ্চিমা দেশগুলিতে, বিশেষ করে আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানদের উচিত ইহুদীবাদী গোষ্ঠী, তাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কেন্দ্র, দূতাবাস এবং সামরিক কেন্দ্রগুলিকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে লক্ষ্যবস্তু করার জন্য যুদ্ধের নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করা। ইহুদীবাদীদের নেতাদের বিরুদ্ধে টার্গেট কিলিং চালাতে হবে— বিশেষ করে যখন আমেরিকার মাটিতে অস্ত্র পাওয়া খুব সহজ, তাহলে আর কীসের অপেক্ষা? যদি একজন সাধারণ আমেরিকান তার বন্দুক দিয়ে ট্রাম্পকে লক্ষ্যবস্তু করতে পারে, তাহলে এই বন্দুক থাকার সুবিধার পাশাপাশি ঈমানের অন্তর্দৃষ্টি আর সাধারণ অন্তর্দৃষ্টিও আপনাদের রয়েছে। যদি একজন সাধারণ খ্রিস্টান ইসরাঈলি কূটনৈতিক কর্মীদের হত্যা করতে পারে, তাহলে আপনাকে কী বাধা দিচ্ছে?

---

[1] এই জিহাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আরব উপদ্বীপে আল-কায়েদা সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত 'ইন্সপায়ার' পত্রিকাটি পড়া খুবই কার্যকর এবং সহায়ক হবে।

[2] যেমনটি শহীদ শায়খ আনোয়ার আল-আওলাকি রহিমাহুল্লাহ তাঁর ফতোয়ায় স্পষ্ট করেছেন।

- প্রতিটি মুসলমানের জন্য জিহাদের কেন্দ্রগুলির সাথে নিজেকে সংযুক্ত করা অপরিহার্য। যদি সে হিজরত করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার জিহাদের ময়দানগুলোতে ছুটে যাওয়া উচিত, সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত, বারুদের শিল্প শেখা উচিত, তার প্রযুক্তিগত দক্ষতা, বিশেষ করে সামরিক দক্ষতা, সাইবার হ্যাকিং, বিমান চালনা ইত্যাদি উন্নত করা উচিত এবং ইহুদী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জিহাদের নেতাদের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করা উচিত। 'বৈশ্বিক জিহাদের ফ্রন্ট' বিশ্বব্যাপী কোনো দেশ বা মহাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
- বিশ্বব্যাপী ইহুদী শত্রুর পর, এই ইহুদী শত্রুর রক্ষক, স্থানীয় দাসদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং জিহাদের আন্দোলন শুরু করা উচিত। স্থানীয় অত্যাচারীদের সিংহাসন থেকে ফাঁসির মঞ্চে নিক্ষেপ করা উচিত। এমন একটি ইসলামী বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করা উচিত যার ফলে মুসলিম দেশগুলিতে ধার্মিক ও বিচক্ষণ ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা হবে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত বাস্তবায়ন করবে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে ইহুদীদের উপর আঘাত করবে এবং ইসলামের মুজাহিদীন এবং আত্মত্যাগীদেরকে সমর্থন প্রদান করবে। এই যুদ্ধ কয়েক দিনের যুদ্ধ নয়, এটি একটি দীর্ঘ যুদ্ধ; ঈমান ও সম্মানের সাথে যুদ্ধ কৌশল এই যুদ্ধের প্রথম প্রয়োজনীয় বিষয়।
- উম্মাহর আলেম, সুফি ও ধর্ম প্রচারক, সাংবাদিক, কবি ও লেখকদের কর্তব্য হলো কুরআনের নির্দেশ 'ওয়াহাররিদিল

মু'মিনীন'[3]-এর বাস্তব রূপ ধারণ করা। মসজিদের মিনার ও মিম্বর থেকে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে শরীয়ত বাস্তবায়নের আওয়াজ তুলুন। জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি সমাবেশে ধর্মীয় কর্তব্য, সৎ নৈতিকতা এবং তাগুতগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সাথে প্রচার প্রসার করুন।

- উম্মাহর সচ্ছল ও ধনী ব্যক্তিদের কর্তব্য হলো-প্রথমত, তাদের সম্পদ দিয়ে উম্মাহর মুজাহিদ সন্তানদের সমর্থন করা, গাজার জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া ক্ষুধা ও অপমানের যুদ্ধে তাদের সম্পদ দিয়ে তাদের সহায়তা করা। দ্বিতীয়ত, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলমানদের উপকারে আসে এমন ব্যবসা সংগঠিত করা। সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হলো মুসলিম চিকিৎসার উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে মুসলমানরা কাফেরদের কোম্পানি, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের অধীনে ওষুধ তৈরিকারী এবং ওষুধকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্লক করতে পারে।

  একইভাবে দানশীলদের জন্য অপরিহার্য হলো—মুসলিম অধ্যুষিত মুক্ত ভূখণ্ডে, যেমন মধ্য এশিয়া থেকে আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত, শিল্পকারখানা গড়ে তোলা। এভাবে 'মুসলিম সমাজের জন্য' 'বিকল্প উৎপাদন শক্তি' তৈরি হবে এবং বিদেশি ব্র্যান্ডের ওপর নির্ভরতা কমবে। এমনকি অস্ত্র শিল্পেরও মূল ভিত্তি হলো পুঁজি।

---

[3] "ওয়া হাররিদিল মুমিনীন" (وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ) — এটি কুরআনুল কারীমের সূরা আনফালের ৬৫ নাম্বার আয়াতের অংশ। —সম্পাদক

যেমন বলা হয়—যিনি তীর তৈরি করেন, তিনি তীর চালকের সমান সাওয়াব পান।

- জ্ঞানের পরিসর কিংবা আত্মশুদ্ধির আঙিনায়—আমাদের উজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, শাহ আব্দুল আজিজ, শাহ ইসমাইল শহীদ থেকে শুরু করে কাসিম নানুতবী ও শায়খুল হিন্দ পর্যন্ত—আমাদের মাদরাসাগুলো জিহাদের প্রস্তুতিকেন্দ্র ও প্রশিক্ষণাগারের ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের খানকাহগুলো সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ ও ইমাম শামিলের মতো নির্মল চরিত্রের মানুষ গড়ে তুলেছে। তখন তারা শামেলির যুদ্ধের ময়দান সাজিয়েছেন। আমাদের আলেমরা ছিলেন কলম ও ফতোয়ার মানুষ, আবার প্রয়োজনের সময় তারাই নেতৃত্ব দিয়েছেন শামেলীর ময়দানে। যেমন সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ বলেছিলেন—আধ্যাত্মিক উন্নতি সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে জিহাদের খানকাহতে; অন্য কোথাও এতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়নি।
- মসজিদের ইমামগণ ও জামাতে নামায পরিচালনাকারীদের বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে—কষ্ট ও বিপদের সময়ে কুনুতে নাযিলা পাঠ করা। কেননা এই দোয়া ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ সুন্নাহ, যা তিনি দুঃসময়ে পালন করতেন।
- অর্থনৈতিক বয়কটের বাস্তব উদাহরণ আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি—এর মাধ্যমে জায়নবাদী প্রভাবাধীন বহু বৃহৎ কোম্পানি বহু মুসলিম দেশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই মুসলিম সমাজের জন্য অপরিহার্য—এই অর্থনৈতিক বয়কটকে আরও শক্তিশালী ও ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়া।

জেনে রাখবেন, জিহাদ এই উম্মতের কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা দলের দায়িত্ব নয়। এটি গোটা উম্মতের উপর বর্তানো একটি সামষ্টিক দায়িত্ব। যখন আমরা বলি ফরযে আইন (এটি প্রত্যেকের জন্য জরুরি কর্তব্য) হওয়ার কথা বলি, তখন এর অর্থ এই নয় যে নামায, যাকাত, দাওয়াত ইলাল্লাহ, আত্মশুদ্ধি কিংবা দ্বীনের অন্য কোনো খিদমতকে আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করছি। আমরা বলতে চাই—এটি যেন তাবুকের সময়ের মতো এক সর্বজনীন আহ্বান। এখন সবারই এগিয়ে আসা জরুরি। তবে এ দায়িত্ব পালনের অর্থ এই নয় যে, অন্য ইবাদাত অথবা ফরয কাজগুলো স্থগিত হয়ে যাবে। এ ধরনের বিভ্রান্তি আসলে শয়তান ও প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা।

এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীনের মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন; মুহাম্মদী উম্মতের নারীদের ইজ্জতের, ইয়াতীম, বিধবা ও ক্ষুধার্ত বৃদ্ধদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার প্রশ্ন। প্রকাশ্যে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র ব্যক্তিত্বকে অপমান করা হচ্ছে। আমাদের সম্মানকে চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে—যদি গাজার মানুষ উম্মতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর অংশ হয়, তবে কেন তাদের রক্ষা করার জন্য মুহাম্মাদ ﷺ আজ পৃথিবীতে নেই?

আমরা যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসার দাবি করি—আমরা কি এমন উপহাস ও নির্লজ্জ আক্রমণ সহ্য করে যাব?

یہ اُنؐ کے 'دین' کی حرمت، ادھر یہ سر سلامت بھی!؟

جگر کے خوں سے اب یہ داغ دھونے کی تمنا ہے

*"ওদিকে তাঁর দ্বীনের পবিত্রতা, আর এদিকে আমাদের মাথা অক্ষত!*

*হৃদয়ের রক্ত দিয়ে এখন এই কলঙ্ক ধুয়ে ফেলার তৃষ্ণা জেগেছে।"*

মনে রাখবেন—এ মুহূর্তে সময়ের সবচেয়ে জরুরি ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো—যেকোনোভাবে এবং যেকোনো মূল্যে গাজার মানুষের উপর হওয়া হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করা এবং তাদের অবরোধ দূর করা। এজন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে—প্রতিরক্ষা কৌশল, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, দূতাবাস অবরোধের মতো জনমুখী আন্দোলন, কিংবা ফ্রিডম ফ্লোটিলা ও কনভয় অব সামুদ-এর মতো উদ্যোগ। তবে এসব কর্মসূচি গ্রহণ করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে—গাজার জনগণকে কার্যত সাহায্য করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আমরা আমাদের প্রাণশক্তি ও দৃঢ়তা সেভাবে বুকের মাঝে ধারণ করতে পারবো, ঠিক যেভাবে দুনিয়ার মানুষ এই প্রাণকে ভালোবাসে। তাদের প্রকৃত সহায়তা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমাদের ভেতরে থাকবে সেই ঈমান ও আত্মত্যাগের মানসিকতা যেমনটি গাজার মানুষের বুকের ভেতরে প্রবাহিত হচ্ছে। এই সহায়তা বাস্তবায়িত হবে তখনই, যখন দুনিয়ার মোহকে পরিত্যাগ করে আত্মোৎসর্গের মানসিকতা দৃঢ় হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের বিশেষ পদক্ষেপ নিশ্চয়ই বিশেষভাবে মুজাহিদীন ও আত্মত্যাগী সৈনিকদের কাজ, কিন্তু দূতাবাস অবরোধ, রাজনৈতিক প্রতিবাদ, জনঅভিযান কিংবা ফ্রিডম ফ্লোটিলা ধরনের বৃহৎ উদ্যোগও আত্মত্যাগ ও দৃঢ় মানসিকতা ছাড়া সম্ভব নয়।

আবারও বলছি—সময়ের দাবি এখন এটাই: যেকোনোভাবে, যেকোনো মূল্যে গাজার গণহত্যা থামাতে হবে এবং অবরোধ ভাঙতে হবে।

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت-

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার পছন্দনীয় ও সন্তোষজনক কাজে সফল করুন, আমাদের রক্ত ও জীবন থেকে যতটুকু চান নিন, যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হন। হে আল্লাহ! যেসব বিষয়ে মতভেদ হয়, আপনার অনুমতিক্রমে আমাদেরকে তাতে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। হে আল্লাহ! আমাদের বাড়িয়ে দিন, কমিয়ে দেবেন না; সম্মানিত করুন, হেয় করবেন না; দান করুন, বঞ্চিত করবেন না; আমাদেরকে অগ্রাধিকার দিন, আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দেবেন না; আমাদেরকে সন্তুষ্ট করুন এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি—দৃঢ়তার, সঠিক সিদ্ধান্তের, আপনার নেয়ামতের শোকর আদায়ের এবং উত্তম ইবাদতের। হে আল্লাহ! যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বীনের সাহায্য করেন, তাঁদেরকে সাহায্য করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর যাঁরা দ্বীনকে নিরাশ্রয় করেন, তাঁদেরকে পরাভূত করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।”

# দারুল ইফতা

# গাজার সাম্প্রতিক যুদ্ধ ও মুসলমানদের উপর জিহাদের ফরয হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া

**সিয়াসাত, জিহাদ ও রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান সংক্রান্ত**

# দারুল ইফতা

আল-কায়েদা উপমহাদেশ

**তারিখ: ১০-১-১৪৪৭ হিজরী** **ফতোয়া নং: ০১**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম**

প্রশ্ন: বর্তমানে গাজার উপর ইসরাঈলি যুদ্ধ চলমান রয়েছে ৬০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে। এ সময়ে গাজার মুসলমানরা ইতিহাসের ভয়াবহতম নির্যাতন ও ধ্বংস যজ্ঞের শিকার হয়েছেন। মুজাহিদরা আত্মরক্ষার লড়াই চালাচ্ছেন, কিন্তু সংখ্যায় ও শক্তিতে তারা পর্যাপ্ত নন। এই পরিস্থিতিতে—গাজার মুসলমানদের সাহায্য করা এবং সে উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা—সমস্ত মুসলমানদের জন্য কি ফরযে আইন?

ফতোয়া:

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

নিঃসন্দেহে, আজ গাজায় ইসরাঈলি আগ্রাসন ঠেকাতে, ক্ষুধা-দারিদ্র্যে জর্জরিত ও অসহায় মুসলমানদের সাহায্যে, ইসরাঈল এবং তার মদদদাতা আমেরিকা ও অন্যান্য ক্রুসেডার মিত্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ—সমস্ত মুসলমানের জন্য ফরযে আইন। এ ফরয হওয়ার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত:

**এক.** এই জিহাদ কেবল চলমান যুদ্ধ থামানো ও গাজা মুক্তির জন্য নয়, বরং যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের প্রথম কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস ইসরাঈলি দখলমুক্ত না হবে এবং সমগ্র ফিলিস্তিন মুক্ত না হবে, ততদিন পর্যন্ত এটি ফরয থাকবে। এই ফরয আদায়ের উদ্দেশ্যে সমগ্র উম্মাহর পক্ষ থেকে গাজার মুজাহিদরা, শহীদ নেতা ইয়াহইয়া সিনওয়ার রহিমাহুল্লাহ ও শহীদ নেতা মুহাম্মাদ দেইফ রহিমাহুমাল্লাহর নেতৃত্বে, 'তুফানুল আকসা' অভিযানে অবতীর্ণ হয়েছেন। বাস্তবে, আকসা মুক্তির জন্য জিহাদ ফরয হয়েছিল সেই মুহূর্ত থেকেই, যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানি খেলাফত পরাজিত হয়ে ব্রিটেন ফিলিস্তিন দখল করে।

**দুই.** যখন কাফেররা মুসলমানদের ভূমিতে আক্রমণ করে, তখন প্রথমে স্থানীয় মুসলমানদের উপর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরযে আইন হয়। যদি তারা পর্যাপ্ত না হয় বা অলসতা করে, তবে নিকটবর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর ফরয হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী এই দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হয়ে পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত মুসলমানের উপর বর্তায়। এই অবস্থায় জিহাদে যাওয়ার জন্য সন্তানকে পিতা-মাতার অনুমতি নিতে হয় না।

**তিন.** এই ফরয শুধু শাসক ও সেনাদের জন্য নয়, বরং আলেম-উলামা ও সাধারণ মুসলমান সকলের জন্য প্রযোজ্য। কুরআন-সুন্নাহর দলীল এবং ফুকাহাদের বয়ান এর প্রমাণ। শুধু স্থায়ী রোগে আক্রান্ত, শারীরিকভাবে অক্ষম বা যাত্রার খরচ জোগাড় করতে অক্ষম ব্যক্তিরা এই ফরয থেকে অব্যাহতি পাবেন। তবে যিনি নিজে যেতে পারবেন না কিন্তু সম্পদশালী, তার উপর অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করা ফরয। আর যার না আছে অর্থ, না আছে শারীরিক শক্তি, তার উপর অন্তত ভাষা দিয়ে জিহাদ করা ফরয—অর্থাৎ জিহাদের ফরযিয়াত প্রচার করা ও অন্যদের উদ্বুদ্ধ করা।

**চার.** আমেরিকা ও কিছু ইউরোপীয় ক্রুসেডার রাষ্ট্র এ যুদ্ধে ইসরাঈলের সহযোদ্ধা; তাই তাদের বিরুদ্ধেও জিহাদ ফরয। যুদ্ধের সহায়ককে মূল যোদ্ধার সমান গণ্য করা হয়। সুতরাং, এই ফরয শুধু ইসরাঈলের সীমার মধ্যে লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিশ্বের যেকোনো স্থানে অবস্থিত এসব দেশের দূতাবাস, সামরিক ঘাঁটি ও সরকারি প্রতিনিধিদেরও লক্ষ্যবস্তু করা ফরয। এখানে 'আমান' (শরঈ নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি)-এর ভ্রান্ত ধারণা প্রযোজ্য নয়, কারণ বর্তমান মুসলিম শাসকরা তাদের অধীন ও নিপীড়িত অবস্থায় আছে, আর শরীয়তে এ ধরনের 'আমান'-এর কোনো মূল্য নেই। তাছাড়া, এসব দেশ তাদের ঘাঁটি ও দূতাবাস থেকে ক্রমাগত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

**পাঁচ.** যে মুসলমান ফিলিস্তিনে পৌঁছে জিহাদে অংশ নিতে পারে, তার উপর সেখানে গিয়ে অংশগ্রহণ করা ফরয। আর যে মুসলমান বিশ্বের যেকোনো স্থানে ক্রুসেডার-জায়নবাদী লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম, তার জন্য সেইভাবে অংশগ্রহণ ফরয।

**ছয়.** যাদের বর্তমানে কোনো ধরনের সক্ষমতা নেই, তাদের উপর এই সক্ষমতা অর্জন করা ফরয, যাতে সুযোগ আসলে তারা আকসা মুক্তির ফরয দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং গোনাহ থেকে বাঁচতে পারে। তবে যারা স্থায়ীভাবে এমন অক্ষমতায় ভুগছে, যার নিরাময়ের কোনো উপায় নেই, তারা এর থেকে মুক্ত।

والله أعلم بالصواب

**মুফতী হাবিবুল্লাহ খান (আফাল্লাহু আনহু)**

**দলীল ও প্রমাণসমূহ:**

**এক.** আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“তোমরা কেন আল্লাহর পথে এবং সেই নির্যাতিত পুরুষ, নারী ও শিশুদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করছ না, যারা বলে— ‘হে আমাদের প্রতিপালক! এই অত্যাচারী জনপদ থেকে আমাদের বের করে দাও; এবং আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করো, আর আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী দাও’।” [সূরা আন-নিসা ০৪:৭৫]

**দুই.** আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ

لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“দুর্বলদের জন্য, অসুস্থদের জন্য, কিংবা যারা ব্যয় করার সামর্থ্য রাখে না— তাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিক থাকে। সৎকর্মশীলদের জন্য কোনো দোষ নেই; আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর তাদের জন্যও দোষ নেই— যারা তোমার কাছে এসেছিল যাতে তুমি তাদের বাহন দাও, আর তুমি বলেছিলে: ‘আমার কাছে এমন কিছু নেই যাতে তোমাদের চড়াতে পারি।’ তখন তারা ফিরে গেল, আর তাদের চোখ অশ্রুধারায় ভিজে যাচ্ছিল— এই দুঃখে যে তারা ব্যয় করার কিছুই পেল না। কিন্তু দোষ সেই সব লোকের, যারা ধনী হয়েও তোমার কাছে অনুমতি চায় এবং পিছিয়ে থাকতে সন্তুষ্ট হয়, আর আল্লাহ তাদের হৃদয় সিল করে দিয়েছেন— ফলে তারা কিছুই বোঝে না।” [সূরা আত-তাওবা ০৯:৯১-৯৩]

**তিন.** আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

“যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা রাখত, তবে অবশ্যই তারা এর জন্য প্রস্তুতি নিত; কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়া অপছন্দ করলেন, তাই তিনি তাদের মন ভেঙে দিলেন এবং বলা হলো— ‘বসে থাকো তাদের সঙ্গে যারা বসে থাকে।” [সূরা আত-তাওবা: ৪৬]

**চার.** তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে—

فخرج من هذا الحكم من لا يستطيع الخروج من الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون او ما يركبون عليه ولا يستطيعون الشيء وبقي من يستطيع الخروج ولو بنوع مشقة وذلك لاجل النفير العام- (التفسير المظهري: (٤/٢٢٠)، ط. رشيدية)

“এই বিধান থেকে ছাড় পাবে ওই সমস্ত লোক, যারা দুর্বল, অসুস্থ, ব্যয় করার মতো কিছু নেই, বাহন নেই— অর্থাৎ যাদের কোনো সামর্থ্যই নেই। কিন্তু যারা কিছুটা কষ্ট সহ্য করেও বের হতে পারে, তাদের জন্য দায়বদ্ধতা রয়ে গেছে— বিশেষত যখন সর্বজনীন জিহাদের ডাক দেওয়া হয়।” (তাফসীরে মাযহারী: ৪/২২০, মুদ্রন: রাশিদিয়া)

**পাঁচ.** আহকামুল কুরআন-এ ইমাম আল-জাসসাস রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন—

وَمَعْلُومٌ فِي اعْتِقَادِ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ إذَا خَافَ أَهْلُ الثُّغُورِ مِنْ الْعَدُوِّ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ مُقَاوِمَةٌ لَهُمْ فَخَافُوا عَلَى بِلَادِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى كَافَّةِ الْأُمَّةِ أَنْ يَنْفِرُ إلَيْهِمْ مَنْ يَكُفُّ عَادِيَتَهُمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأُمَّةِ إذا لَيْسَ مِنْ قَوْلِ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إبَاحَةُ القعود عنهم حين يَسْتَبِيحُوا دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَسَبْيَ ذَرَارِيِّهِمْ. (أحكام القران للجصاص: (٣/١٤٦)، ط. دار الكتب العلمية)

“সমস্ত মুসলমানের বিশ্বাস— যদি সীমান্ত এলাকার মানুষ শত্রুর আশঙ্কা করে এবং তাদের পক্ষে প্রতিরোধ সম্ভব না হয়, আর তারা নিজের দেশ, প্রাণ ও পরিবার-পরিজনের জন্য ভয় পায়, তবে গোটা উম্মাহর ওপর ফরয হয়ে যায় এমন লোকদের সাহায্যে এগিয়ে আসা, যারা শত্রুর হাত থেকে মুসলিমদের রক্ষা করবে। এ ব্যাপারে উম্মাহর মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। কারণ কোনো মুসলমানের পক্ষেই বৈধ নয় এমন পরিস্থিতিতে বসে থাকা, যখন শত্রু মুসলিমদের রক্ত ও তাদের পরিবার-পরিজনকে হালাল মনে করে আক্রমণ চালাচ্ছে।” (আহকামুল কুরআন, ৩/১৪৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ)

**ছয়.** আল-মুহীতুল বুরহানীতে বলা হয়েছে—

وإنما يفترض فرض عين على من كان يقرب من العدو، وهم يقدرون على الجهاد، فأما على من وراءهم يبعد من العدو، فإنه يفرض عليه فرض كفاية لا فرض عين حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليه، فأما إذا احتيج إليه بأن عجز من كان يقرب من العدو من المقاومة مع العدو، أو لم يعجزوا عن المقاومة إلا أنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا، فإنه يفترض على من يليهم فرض عين كالصوم والصلاة ولا يسعهم تركه، ثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً، على هذا الترتيب والتدريج. (المحيط البرهاني: (٥/٣٩٤)، ط. دار الكتب العلمية)

**“শত্রুর নিকটবর্তী এলাকায় যারা বাস করে এবং জিহাদের সামর্থ্য রাখে, তাদের ওপর এটি ফরযে-আইন। দূরের লোকদের জন্য প্রথমে এটি ফরযে-কিফায়া, অর্থাৎ প্রয়োজন না হলে তারা অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু যদি নিকটবর্তী লোকেরা প্রতিরোধে অক্ষম হয়, কিংবা তারা সক্ষম হয়েও অলসতা করে, তবে তাদের পরবর্তী এলাকাবাসীর ওপর এটি ফরযে-আইন হয়ে যায়— যেমন সালাত ও সাওম ফরয হয়। এভাবে ধাপে ধাপে প্রয়োজন অনুযায়ী তা গোটা মুসলিম বিশ্বের ওপরও ফরয হয়ে যেতে পারে। (আল-মুহীতুল বুরহানী, ৫/৩৯৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ)**

**সাত.** বাদায়েউস সানায়ে-এ ইমাম কাসানী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন—

وَأَمَّا بَيَانُ مَنْ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ فَنَقُولُ إنَّهُ لَا يُفْتَرَضُ إلَّا عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ فَمَنْ لَا قُدْرَةَ لَهُ لَا جِهَادَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْجِهَادَ بَذْلُ الْجُهْدِ، وَهُوَ الْوُسْعُ وَالطَّاقَةُ بِالْقِتَالِ، أَوْ الْمُبَالَغَةُ فِي عَمَلِ الْقِتَالِ، وَمَنْ لَا وُسْعَ لَهُ كَيْفَ يَبْذُلُ الْوُسْعَ وَالْعَمَلَ، فَلَا يُفْرَضُ عَلَى الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ، وَالزَّمِنِ وَالْمُقْعَدِ، وَالشَّيْخِ الْهَرِمِ، وَالْمَرِيضِ وَالضَّعِيفِ، وَالَّذِي لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ، قَالَ اللَّهُ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: 61] الْآيَةَ وَقَالَ – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَزَّ مِنْ قَائِلٍ – {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 91] إذَا نَصَحُوا

لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ عَذَرَ اللَّهُ – جَلَّ شَأْنُهُ – هَؤُلَاءِ بِالتَّخَلُّفِ عَنْ الْجِهَادِ وَرَفَعَ الْحَرَجَ عَنْهُمْ. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (٩/٣٤٢)، ط. دار الحديث)

“জিহাদ কেবল তার ওপর ফরয, যে সামর্থ্যবান। অন্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ, অতিবৃদ্ধ, একেবারে দরিদ্র— এদের ওপর জিহাদ ফরয নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

ليس على الاعمى حرج

“অন্ধের ওপর কোনো দোষ নেই...” (সূরা আন-নূর ২৪:৬১)

আল্লাহ পাক আরো বলেছেন-

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

“দুর্বল, অসুস্থ ও যারা ব্যয় করার মতো কিছুই পায় না— তাদের জন্য কোনো অপরাধ নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিক থাকে” (সূরা আত-তাওবা ০৯:৯১)। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন এবং তাদের জন্য কোনো পাপ রাখেননি। (বাদায়েউস সানায়ে, ৯/৩৪২, দারুল হাদীস)

**আট.** আদ-দুররুল মুখতার-এ এসেছে—

(إنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ فَيَخْرُجُ الْكُلُّ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ) وَيَأْثَمُ الزَّوْجُ وَنَحْوُهُ بِالْمَنْعِ ذَخِيرَةٌ (وَلَا بُدَّ) لِفَرْضِيَّتِهِ (مِنْ قَيْدٍ آخَرَ وَهُوَ (الِاسْتِطَاعَةُ) فَلَا يَخْرُجُ الْمَرِيضُ الدَّنِفُ، أَمَّا مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ، دُونَ الدَّفْعِ يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ لِتَكْثِيرِ السَّوَادِ إرْهَابًا فَتْحٌ. وَفِي السِّرَاجِ وَشُرِطَ لِوُجُوبِهِ: الْقُدْرَةُ عَلَى السِّلَاحِ لَا أَمْنُ الطَّرِيقِ. (الدر المختار: 330، ط. دار الكتب العلمية)

“যদি শত্রু হঠাৎ আক্রমণ চালায়, তবে সবাই বের হবে— এমনকি অনুমতি ছাড়াও। স্বামী বা অভিভাবক বাধা দিলে তিনি গুনাহগার হবেন। তবে শর্ত

হলো— সামর্থ্য থাকা। অসুস্থ বা অক্ষম ব্যক্তির ওপর এটি নেই। যারা প্রতিরোধে সক্ষম না হলেও বের হতে পারে, তাদের উচিত সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বের হওয়া— যাতে শত্রুর মনে ভয় সৃষ্টি হয়। (আদ-দুররুল মুখতার, পৃ. ৩৩০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ)

**নয়.** আহকামুল কুরআন-এ আরও বলা হয়েছে—

فَأَكَّدَ اللهُ تَعَالَى فَرْضَ الْجِهَادِ عَلَى سَائِرِ الْمُكَلَّفِينَ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَبِغَيْرِهَا عَلَى حَسَبِ الْإِمْكَانِ فَقَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وَسَلَّمَ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إلا نفسك وحرض المؤمنين فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ فَرْضَ الْجِهَادِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا بِنَفْسِهِ وَمُبَاشَرَةِ الْقِتَالِ وَحُضُورِهِ وَالْآخَرُ بِالتَّحْرِيضِ وَالْحَثِّ والبيان لأنه صلّى اللهُ عليه وآله وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيمَا فَرَضَهُ عَلَيْهِ إنْفَاقَ الْمَالِ وَقَالَ لِغَيْرِهِ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فَأَلْزَمَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ وَلَهُ مَالٌ فَرْضَ الْجِهَادِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ قَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إذا نصحوا لله ورسوله فَلَمْ يُخِلَّ مَنْ أَسْقَطَ عَنْهُ فَرْضَ الْجِهَادِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ لِلْعَجْزِ وَالْعُدْمِ مِنْ إيجَابِ فَرْضِهِ بِالنُّصْحِ للهِ وَرَسُولِهِ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ إلا وعليه فرض الجهاد عن مَرَاتِبِهِ الَّتِي وَصَفْنَا. (أحكام القران للجصاص: (٣/١٤٨)، ط. العلمية)

“আল্লাহ তাআলা জিহাদের ফরযিয়াত দুইভাবে দিয়েছেন— (১) নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, (২) অন্যদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে। আর যাদের কাছে সম্পদ আছে, তাদের জন্য ফরয হয়েছে— নিজের জান ও সম্পদ উভয় দিয়ে জিহাদ করা। তবে যারা অসামর্থ্যের কারণে নিজের জান ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করতে পারছে না, তাদের ওপর থেকেও দায়িত্ব পুরোপুরি সরে যায় না; বরং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিক পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব থেকে যায়। (আহকামুল কুরআন, ৩/১৪৮, আল-ইলমিয়্যাহ)

**দশ.** শরহুস সিয়ারিল কাবীর-এ বলা হয়েছে—

لَوِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَمِيرًا، أَوْ امْتَنَعُوا وَقَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ نَقْضًا لِأَمَانِهِمْ. (شرح السير الكبير: (٢/٧٥٣)، ت. صلاح الدين المنجد)

**"যদি কোনো মুআহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) দারুল ইসলাম-এ বাস করে এবং তারা নিজেদের নেতা নিয়োগ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে এটি তাদের আমান ভঙ্গ করার শামিল। (শরহুস সিয়ারিল কাবীর, ২/৭৫৩)**

**এগারো.** আল-ইখতিয়ার-এ এসেছে—

قَالَ: (وَلَا يَصِحُّ أَمَانُ ذِمِّيٍّ وَلَا أَسِيرٍ، وَلَا تَاجِرٍ فِيهِمْ، وَلَا مَنْ أَسْلَمَ عِنْدَهُمْ وَهُوَ فِيهِمْ) لِأَنَّ الذِّمِّيَّ مُتَّهَمٌ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْبَاقُونَ مَقْهُورُونَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَخَافُونَهُمْ فَلَا يَكُونُونَ مِنْ أَهْلِ الْبَيَانِ عَلَى مَا بَيَّنَّا. (الإختيار لتعليل المختار: (٤/١٢٣)، ط. دار الكتب العلمية)

**"আহলুজ জিম্মা, যুদ্ধবন্দী, তাদের মধ্যে কোনো বণিক বা তাদের সঙ্গে থাকা মুসলমান— তাদের কারোই অন্য কাউকে নিরাপত্তা দেওয়ার বৈধতা নেই। কারণ জিম্মির বিষয়টা সংশয়পূর্ণ, আর অন্যরা তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে— ফলে তারা (অন্য কাউকে) নিরাপত্তা দেওয়ার উপযুক্ত নয়। (আল-ইখতিয়ার, ৪/১২৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ)**

**বারো.** আল-বাহরুর রায়েক-এ বলা হয়েছে—

وَفِي الذَّخِيرَةِ ثُمَّ مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْجِهَادِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجَاهِدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: 78] وَحَقُّ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَيْرِهِ جُعْلًا وَمَنْ عَجَزَ عَنْ الْخُرُوجِ وَلَهُ مَالٌ يَنْبَغِي أَنْ يَبْعَثَ غَيْرَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِمَالِهِ وَمَنْ قَدَرَ بِنَفْسِهِ وَلَا مَالَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ يُعْطِيهِ الْإِمَامُ كِفَايَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ كِفَايَتَهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ غَيْرِهِ جُعْلًا وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجُعْلَ مِنْ غَيْرِهِ. (البحر الرائق: (٥/٧٩)، ط. دار الكتاب الإسلامي)

“যাখিরা কিতাবে এসেছে: যে ব্যক্তি নিজের জান ও সম্পদ উভয় দিয়েই জিহাদে সক্ষম, তার ওপর দুটো দিয়েই জিহাদ করা ফরয। যার শুধু সম্পদ আছে, তার উচিত অন্য কাউকে অর্থ দিয়ে পাঠানো। যার জান আছে কিন্তু সম্পদ নেই, তার জন্য ইমাম রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রয়োজনীয় ব্যয় দেবেন; না দিলে সে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারবে। (আল-বাহরুর রায়েক, ৫/৭৯, দারুল কিতাবুল ইসলামি)

**তেরো.** মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন—

‘ہم مان لیتے ہیں کہ شوکتِ قویہ کا حاصل ہونا اہلِ شوکت کے ساتھ جہاد کرنے کی شرط ہے.....، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ امام وقت کے لیے شوکت حاصل کرنے کا طریقہ آخر کیا ہے؟ کیا شوکت اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے پیٹ سے فوجوں، لشکروں اور سامانِ جنگ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ یا جس وقت جہاد کے لیے مستعد ہوتا ہے، اسی وقت فی الفور غیب سے تمام لشکر و افواج اور سامانِ جنگ عطا ہوجاتا ہے؟ یہ بات نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوسکتی ہے۔..... پس جو شخص کہتا ہے کہ امام کی قوت وشوکت جہاد کی شرط ہے اور یہ شوکت ہم کو حاصل نہیں، اس کو لازم ہے کہ پہلے خود آئے اور بقدر استطاعت سامانِ جنگ ساتھ لائے اور اس معاملے میں کسی دوسرے کی شوکت کا انتظار اصلا جائز نہیں''۔ (مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ دعوت وعزیمت، حصہ ششم، ج 1، ص 554، مجلس نشریات اسلام)

“আমরা মানি— শক্তিশালী বাহিনী থাকাটা জিহাদের জন্য অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি— ইমামের সেই শক্তি আসবে কোথা থেকে? তিনি কি মায়ের গর্ভ থেকেই বাহিনী, সৈন্যদল ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে জন্ম নেন? অথবা জিহাদের সংকল্প করলেই কি হঠাৎ আকাশ থেকে সব সেনা ও সরঞ্জাম নেমে আসে? ইতিহাসে এমন কখনো ঘটেনি, ভবিষ্যতেও ঘটবে না। অতএব, যে বলে— ‘ইমামের শক্তি না থাকলে জিহাদ নেই’, তার

উচিত প্রথমে নিজে এগিয়ে আসা এবং যতটুকু সম্ভব প্রস্তুতি নিয়ে আসা। অন্যের শক্তির জন্য অপেক্ষা করা মোটেও বৈধ নয়।" (তারিখে দাওয়াত ও আজীমত, খণ্ড ৬, ভলিউম ১, পৃ. ৫৫৪, মজলিসে নাশরিয়াতুল ইসলাম)

**সত্যায়ন করেছেন:**

মুফতী মুহাম্মাদ মতিন মুঘল,

মুফতী আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মাহদি,

মুফতী আব্দুর রহমান রহমানি,

মুফতী বদরুদ্দীন গজনভি,

মুফতী মাহমুদ হাসানি,

মুফতী আবুল হাসানাইন মুহাম্মাদ হাসান আশ-শাইবি,

শায়খ উবায়দুর রহমান আল-মুরাবিত,

মুফতী মুহাম্মাদ লুকমান বরিশালি,

মাওলানা আবু বকর শিনওয়ারি,

মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ ইউসুফজাই,

মাওলানা মুহাম্মাদ খুবাইব বারকি,

মাওলানা আব্দুর রহমান কাসেমি।

# ফিকির ও মানহাজ

# জাতিরাষ্ট্রের ইসলামীকরণ: স্বপ্ন ও বাস্তবতা

**—আব্দুর রব বালুচ**

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিখ নিটশে বলেছেন—

“He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you.”

“যারা দানবের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাদের খেয়াল রাখা উচিত, যেন তারা নিজেরা দানবে পরিণত না হয়ে যান। অন্ধকার জগতে দীর্ঘক্ষণ ডুবে থাকলে, অন্ধকার তোমার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।”

এ কথাটির সরল অর্থ হলো, কেউ যখন কোনো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে, অবচেতনভাবেই সেই অশুভ শক্তি তার মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যদিও এটি কোনো সর্বজনবিদিত নিয়ম না, কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। কারণ, যারা বাতিলের মোকাবিলা করেন, বাস্তবে তারাও সেই বাতিল দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার একটি আশঙ্কা সব সময় থেকেই যায়। এমনকি মুসলিম দেশগুলোতে সক্রিয় ইসলামী দলগুলোও এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত না। তবে যদি বুদ্ধিবৃত্তিক দৃঢ়তা, সামসময়িক বিশ্ব সম্পর্কে গভীর জানা-শোনা এবং তাযকিয়া ও আল্লাহমুখিতা থাকে, তবে আশা করা যায়, এই আশঙ্কা থেকে তারা অনেকটাই মুক্ত থাকবেন।

কারণ, দ্বীন কায়েমের জন্য যারা চেষ্টা করছেন, পশ্চিমের সাথে তাদের লড়াই একমুখী না। একদিকে পশ্চিমের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির মোকাবিলা করতে হচ্ছে, অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও প্রতিরোধ করতে হচ্ছে। এভাবে বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াইটাই পশ্চিমাদের সাথে আমাদের আসল লড়াই। সামরিক লড়াই তো বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের একটি ক্ষেত্র কেবল; তবে অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই দ্বীন কায়েমের সংগ্রামের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে পশ্চিমা চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে সব সময়ই সরব ছিলেন, পশ্চিমের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন তত্ত্ব ও ধারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং এখনও আছেন। ঠিক এ কারণেই নিকট অতীতে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে পশ্চিমা রাজনৈতিক দর্শন, বিশেষ করে গণতন্ত্রের ব্যাপারে বিপুল সমালোচনা ও খণ্ডন করা হয়েছে। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যতটা গুরুত্ব দিয়ে লেখালিখি হয়েছে, সেই তুলনায় স্টেট বা রাষ্ট্র ধারণার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়নি বললেই চলে, অথচ এটাই হলো পশ্চিমা রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি। বাহ্যিকভাবে এর কারণ এটাই মনে হয় যে, পশ্চিমারা বেশ বড় একটি প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। তারা তাদের উৎপাদিত এই ধারণাকে প্রাকৃতিক বিবর্তনের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে পৃথিবীতে ছড়িয়েছে আর আমরাও সেটাকে গ্রহণ করে নিয়েছি।

পশ্চিমাদের এই প্রোপাগান্ডার কারণেই আধুনিক রাষ্ট্র (State) এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাকে খিলাফত, ইমারত ও রাজতন্ত্রের মতো অতীতের বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থার আধুনিক রূপ হিসেবে বিবেচনা করার একটি প্রবণতা দেখা যায়। এই প্রবণতা শুধু ভুলই না, মারাত্মক ভয়ংকরও বটে।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, বর্তমানে যখনই রাষ্ট্র (State) বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের (State Institutions) কথা বলা হয়, তখন এর দ্বারা কেবলই 'আধুনিক পশ্চিমা জাতিরাষ্ট্র' (Modern Western Nation State) এবং এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Institutions) উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এই আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিছুতেই অতীতের শাসন ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিবর্তিত রূপ নয়; বরং ইউরোপের ধর্মহীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে জন্ম নেওয়া নিরেট পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান এটি। কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতির বিশেষ দর্শন ও চিন্তাধারার প্রভাববলয়ে থেকে যত প্রতিষ্ঠানই গড়ে ওঠে—চাই তা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হোক, যেমন: রাষ্ট্র, অথবা সামাজিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হোক—তা সেই দর্শনকে শুধু ধারণই করে না, বরং সে দর্শনের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যেও কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ—বর্তমানে আধুনিক ব্যাংকিং সিস্টেমকে ইসলামাইজেশন করে ইসলামী ব্যাংকিং চালু করা হচ্ছে। এর ফলে সমাজে ইসলামের অর্থনৈতিক নীতি-আদর্শের পরিবর্তে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার নীতি-আদর্শ প্রসার লাভ করছে এবং ইসলামের পোশাকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ছে। এ সব কারণেই দ্বীন কায়েমের মেহনতের সাথে জড়িতদের জন্য রাষ্ট্রকে (State) এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা উচিত এবং তথাকথিত ইসলামী রাষ্ট্র (Islamic State) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মেহনত না করে খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই এই প্রবন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে রাষ্ট্রের (State) কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সাথে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পার্থক্য তুলে ধরা হবে।

## আধুনিক রাষ্ট্রের (State) বৈশিষ্ট্যসমূহ

আধুনিক রাষ্ট্রের গঠন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক গবেষকই বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিন্তাবিদ ওয়ায়েল হাল্লাক তার বই Impossible State-এ রাষ্ট্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করেছেন, তা নিম্নরূপ[4] —

১. ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historicity)

২. সার্বভৌমত্বের ধারণা (Sovereignty)

৩. আইন প্রণয়ন ও সহিংসতার অধিকার (Legislation & Violence)

৪. আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন (Bureaucratic Administration)

৫. নাগরিকত্ব (Citizenship)

## ঐতিহাসিক ভিত্তি (Historicity)

State বা রাষ্ট্র একটি বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যা ইউরোপের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক এই রূপটির জন্ম হয়েছে ইউরোপের বিশেষ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে। রাষ্ট্রের এই ধারণাটি জন্মের পেছনে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের প্রভাবে সৃষ্ট বিভিন্ন দর্শনেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের ফলে গীর্জা ও শাসন ক্ষমতাকে আলাদা

[4] Wael Hallaq, Impossible State, 26; ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত।

করার মাধ্যমে জাতিরাষ্ট্রের ধারণার প্রাথমিক রূপ আত্মপ্রকাশ করে এবং এই এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনই রাষ্ট্র নামের নবউদ্ভূত এই দর্শনকে প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক সমর্থনও সরবরাহ করে। আর তাই রাষ্ট্র নামের এই প্রতিষ্ঠানটির মৌলিক বৈশিষ্ট্য 'ঐতিহাসিক ভিত্তি'-কে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, ইতিহাসের বিশেষ কিছু ঘটনার ফলস্বরূপ এই আধুনিক পশ্চিমা জাতিরাষ্ট্র অস্তিত্বলাভ করেছে। রাষ্ট্র ধারণার অস্তিত্বের পেছনে পুঁজিবাদেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। তবে রাষ্ট্র বা স্টেট সব সময় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে না, অনেক রাষ্ট্র (State) কমিউনিস্ট বা সোশালিস্টও হয়ে থাকে।

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে ভিত্তি বানিয়েই ১৮শ শতকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের (Political Sciences) আলোচনায় রাষ্ট্রকে একটি বিমূর্ত (Abstract) ও ধ্রুব ও সর্বজনীন (Universal) বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা শুরু হয় এবং এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তা, উন্নতি-অগ্রগতি ও সভ্যতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়। এ কারণেই তৎকালীন ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকরা কেবল নিজেদেরই সভ্য মানুষ বলে বিশ্বাস করত আর রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছাড়া অন্যান্য শাসন ব্যবস্থার অধীনে বসবাসকারী দুনিয়ার অন্য সকল মানুষকে 'অসভ্য', 'বর্বর' ও 'সেকেলে' মনে করত। এ কারণেই পশ্চিমা উপনিবেশবাদী সরকারগুলো নিজ নিজ উপনিবেশে বসবাসকারী 'অসভ্য' ও 'বর্বর' মানুষদের 'সভ্য' বানানোর জন্য সেখানকার আঞ্চলিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে সমাজ, রাজনীতি ও প্রশাসনে জোরপূর্বক ইউরোপীয় ব্যবস্থা চাপিয়ে দিত।

## সার্বভৌমত্বের ধারণা (Sovereignty)

সার্বভৌমত্ব বা Sovereignty রাষ্ট্রের মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য; বিগত দুই শতকে রাষ্ট্র ধারণায় নানান পরিবর্তন আসলেও এটি সব সময়ই রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অতীতে ক্ষমতার ধারণাটি সাধারণত নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও আদর্শিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো, কিন্তু সব সময় 'ব্যক্তি'-ই হতো ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষমতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়; বরং নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) বিষয়ে পরিণত হয়েছে। (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) এই নৈর্ব্যক্তিক বিমূর্ত সত্তা রাষ্ট্রের বৈধতার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। সার্বভৌমত্বের এই ধারণার একটি দাবি হলো রাষ্ট্রকে তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামষ্টিক রূপ হিসেবে বিবেচনার সাথে সাথে একটি পূর্ণাঙ্গ তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে। সার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক এই ধারণার জন্ম হয়েছে মূলত 'Will of Representation বা প্রতিনিধিত্বের ইচ্ছা'-এর ধারণা থেকে। এই ধারণা অনুযায়ী, রাষ্ট্র নামক বিমূর্ত সত্তার মূর্ত প্রতিনিধিত্ব যাদের মাধ্যমে হয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিকরা নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছা ও ভাগ্যের একমাত্র নিয়ন্ত্রক। রাষ্ট্রের নাগরিকদের এই ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সর্বপ্রকার আনুগত্য ও দাসত্বকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সকল ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও সত্তার অধীনতা পরিপূর্ণরূপে অস্বীকার করা হলেই কেবল রাষ্ট্রের নাগরিকদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত

হবে। সকল প্রকার শক্তির পরাধীনতা প্রত্যাখ্যান করার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে ফরাসি ও মার্কিন বিপ্লবে।[5]

বহিঃশক্তির অধীনতা প্রত্যাখ্যান করা এমন একটি শর্ত, যা ছাড়া সার্বভৌমত্ব কখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই আধুনিক রাষ্ট্র তখনই 'রাষ্ট্র' হয়ে উঠতে পারে, যখন রাষ্ট্রের মৌলিক এই গুণটি (সার্বভৌমত্ব) মেনে নেওয়া হয় এবং জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা (Popular Will)-কেই জনগণের একমাত্র ভাগ্য-নিয়ন্ত্রক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই গণআকাঙ্ক্ষা, Popular Will বা Collective Will—এগুলো সবই কাল্পনিক জিনিস। পৃথক পৃথকভাবে দেশের সকলের মতামত নিয়ে এই পপুলার উইল বা কালেক্টিভ উইলগুলো তৈরি হয় না; বরং এগুলোর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামতের কোনো মূল্যই নেই। এমনকি রাষ্ট্রের ক্ষমতা যদি অগণতান্ত্রিক কোনো শক্তির হাতে চলে যায়, তবু রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের এই ধারণা একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কারণ, গণতন্ত্র না থাকলেও রাষ্ট্র এটাই ভাবে যে, তার সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereign Will) শাসকদের মাধ্যমে সে প্রয়োগ করতে পারবে, শাসক যেমনই হোক না কেন। তাই ক্ষমতা গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে থাকুক বা স্বৈরাচারী সরকারের হাতে থাকুক, সর্বাবস্থায়ই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বহাল থাকে। রাষ্ট্র নিজের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে কীভাবে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্রকে গ্রহণ করে—এখান থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

[5] এখানে বহিঃশক্তি দ্বারা সব ধরনের বহিঃশক্তিই উদ্দেশ্য। এতে ধর্মও অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে ফরাসি বিপ্লবকে একটি মাইলফলক হিসেবে দেখা হয়।

সার্বভৌমত্বের এই ধারণার দুটি দিক আছে—আন্তর্জাতিক ও জাতীয়। আন্তর্জাতিক দিকটি হলো, নিজ নিজ সীমানার মধ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করে এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই স্বজাতির বৈধ প্রতিনিধি মনে করে। এ কারণেই কোনো রাষ্ট্র যদি একনায়কতান্ত্রিক কিংবা স্বৈরাচারীও হয়, তবু সে রাষ্ট্রকেই সে জাতির একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি মনে করা হয়। ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে মেনে নেওয়া হয়। এই আন্তর্জাতিক দিকটি সার্বভৌমত্বের জাতীয় দিকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতীয় পর্যায়ে সার্বভৌমত্বের অর্থ হলো, নিজ সীমানার মধ্যে রাষ্ট্রই সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের চেয়ে বড় কোনো ক্ষমতা রাষ্ট্রের মধ্যে থাকে না। রাষ্ট্রের মধ্যে কেবল তারই আইন চলে। রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনো শক্তি এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না এবং রাষ্ট্রের আইন বাতিল করতে পারে না। কারণ, আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereign Will)-এর প্রকাশ ঘটে।

আর এ কারণেই কোনো রাষ্ট্রের আইনকে চ্যালেঞ্জ করা জনগণের ইচ্ছা (Popular Will)-এর বিরোধিতা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক বা দল যদি রাষ্ট্রের আইনের বিরোধিতা করে, তাহলে এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। এক. রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত আইনের বিরোধিতার মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের মতের বিরোধিতা করছে। কারণ, রাষ্ট্রের আইন পপুলার উইলের মাধ্যমে বানানো হয়েছে আর পপুলার উইল জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন, যার মধ্যে তারাও শামিল। এই ব্যাখ্যার আলোকে তাদের বিরোধিতা যৌক্তিক। দুই. এই বিরোধী গোষ্ঠী রাষ্ট্রে

প্রতিষ্ঠিত আইনের বিরোধিতার মাধ্যমে মূলত নতুন পপুলার উইল বা সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। সহজ ভাষায়, তারা বিদ্যমান পপুলার উইলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নতুন পপুলার উইল প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। তাত্ত্বিকভাবে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এই বিরোধিতা কেবল তখনই বৈধতা লাভ করবে, যখন বিরোধীরা বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাত করে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে ভিন্ন কোনো আইনের অস্তিত্ব সম্ভব না।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অন্যতম ও মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য হলো সহিংসতা বা বলপ্রয়োগের অধিকার (Monopoly on Violence)। রাষ্ট্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী—এই দাবি প্রমাণ করার জন্য সহিংসতা ও শক্তির প্রকাশ ঘটানো অত্যাবশ্যক। বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই এটা প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে কেবল রাষ্ট্রই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং কেবল রাষ্ট্রই বৈধ ইচ্ছা (Legal Will)-এর মালিক।

একটি সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র তখনই অস্তিত্ব লাভ করে, যখন রাষ্ট্রের ধারণার সাথে সাথে 'জাতি' নামক কল্পিত ধারণা (Imagined Construct)-ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এভাবেই কল্পিত রাষ্ট্র ও কল্পিত জাতি মিলে একটি সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়। সার্বভৌম হওয়ার সুবাদে জাতিরাষ্ট্র কারো সৃষ্ট বা মাখলুক হয় না; বরং সে নিজেই নিজের স্রষ্টা ও খালিক হয়ে থাকে। কারণ বৈধ সহিংসতা ও বলপ্রয়োগের দ্বারা আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমেই জাতিরাষ্ট্র নামক এই কল্পিত ধারণার প্রকাশ ঘটে এবং সে এই আইনকে সব সময় প্রতিষ্ঠিত রাখে। এ হিসেবে পল কান (Paul Kahn)-এর দৃষ্টিভঙ্গি বেশ যৌক্তিক। তার মতে, সার্বভৌম রাষ্ট্র নিজেই নিজেকে

সৃষ্টি করতে সক্ষম। খোদা যেমন কোনো জিনিসকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বদান করতে সক্ষম, জাতিরাষ্ট্রও ঠিক তেমন; সে নিজেই নিজেকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করে। সেই সাথে রাষ্ট্রের নিজস্ব ইচ্ছাও থাকে এবং তা প্রকাশ করার ক্ষমতাও সে সংরক্ষণ করে। পল কানের এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও তাওহীদের মধ্যে বেশকিছু মিল রয়েছে। পল কান লিখেছেন—

'প্রথমত, (রাষ্ট্র) একটি সর্বশক্তিমান সত্তা। রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র) যেকোনো শাসন ব্যবস্থাকেই সে নির্বাচন করতে পারে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র স্থান-কালের উর্ধ্বে। মানবজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এবং রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে প্রতিটি স্থানেই তার উপস্থিতি বিদ্যমান। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে আমরা শুধু তার ক্ষমতার প্রকাশ থেকেই অনুভব করতে পারি। বিষয়টা এমন না যে, আগে আমরা জনগণের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি জানতে পারি, তারপর এই সার্বভৌমত্ব কী করতে পারে তা জানতে পারি। বরং আমরা শুরু থেকেই এই বিশ্বাস রাখি যে, জনগণের সার্বভৌমত্ব অবধারিত একটি বিষয়।[6] আর রাষ্ট্রের ক্ষমতা হলো সেই সার্বভৌমত্বের বহিঃপ্রকাশ। আর স্বাভাবিক নিয়ম এটাই যে, কাজের মাধ্যমেই আমরা কর্তার ব্যাপারে জ্ঞানলাভ করি। চতুর্থত, রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম সত্তাকে আমরা তখনই অনুভব করতে পারি, যখন একে একটি

[6] অর্থাৎ রাষ্ট্র হলো কর্তা আর আইন প্রয়োগ হলো তার কর্ম। কিন্তু এই কর্তার পরিচয় ও অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি তার কর্ম দ্বারা। যেমন: আল্লাহ হলেন কর্তা আর দুনিয়ার সবকিছুই তার কর্ম বা প্রকাশ। দুনিয়ার সবকিছুই আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি নির্দেশ করে। স্বয়ং আল্লাহকে আমরা কেউ কখনো দেখি না। তেমনই আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণাও এমন। রাষ্ট্রকে দেখা যায় না, তার কর্ম ও আইন প্রয়োগ থেকে তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। - অনুবাদক

নৈতিক দাবি[7] (Normative Claim) বলে বিশ্বাস করে নিই, যা নিজেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ এবং নিজেদেরকে এই সার্বভৌম সত্তার অংশ ও তারই সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করি এবং তার মাঝেই নিজেদের ছায়া দেখি।'[8]

এভাবে রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া হয়, তাহলে বলতে হবে—একজন মানুষ তখনই মানুষ হয়, যখন সে নিজেকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের চাহিদা অনুযায়ী গড়ে তোলে, সেই সার্বভৌম রাষ্ট্রকেই আইন ও জাতি উভয়ের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। এর ফলে রাষ্ট্রের আইনের মধ্যেই জাতি নিজের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়।

আইন মূলত ক্ষমতারই প্রতিচ্ছবি। আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বে যেহেতু রাষ্ট্রের সার্বভৌম ইচ্ছাই মানুষকে বিশেষভাবে গড়ে তোলে এবং নিজের চাহিদা অনুযায়ী আকৃতি দেয়, তাই তাকে (খ্রিস্টীয়) ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী ঐশ্বরিক ইচ্ছার সমকক্ষ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এনলাইটেনমেন্ট-পরবর্তী সময়ে এনলাইটেনমেন্ট-পূর্ব অনেক ধারণা আত্তীকরণ করা হয়েছে। সার্বভৌমত্বের ধারণাও তেমনই একটি ধারণা, যা এনলাইটেনমেন্ট-পূর্ব সময় থেকে আধুনিক সময়ে আনা হয়েছে। আর অন্যান্য অনেক ধারণার মতো সার্বভৌমত্বের আধুনিক এই ধারণাতেও এনলাইটেনমেন্ট-পূর্ব ধর্মীয় সার্বভৌমত্বের কিছু ছাপ এখনও বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে।

আধুনিক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সব ধারণাই বিশেষ এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানের রূপ ও কাঠামো ধারণ করেছে। যার

[7] কোনো জিনিসের উচিত/অনুচিত হওয়ার নৈতিক দাবি। অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি যে, রাষ্ট্রের এই সার্বভৌম ক্ষমতাটা থাকা উচিত। এটাই হলো এই প্রসঙ্গে নৈতিক দাবি বা Normative Claim ।

[8] Paul W. Kahn, Putting Liberalism in Its Place, 267

কারণে এগুলো স্বতন্ত্র কোনো ধারণা নয়; বরং অতীতের ধর্মীয় ধারণার আধুনিক সেকুলার সংস্করণ। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে ধর্মীয় ধারণাগুলোই রাষ্ট্রের ধারণা ও তত্ত্বে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। যার কারণে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর'-এর স্থলে এর আধুনিক রূপ 'সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র'-এর উদ্ভব হয়েছে। খোদা ও ঈশ্বরের সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র যেমন খোদার মতো আইন প্রণয়ন করতে পারে, এমনইভাবে নিজের বানানো আইন দরকার হলে ভঙ্গও করতে পারে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে যেটাকে মুজিযা বা Miracle বলা হয়, রাষ্ট্র যখন নিজের বানানো আইন ভঙ্গ করে, তখন এটিকেও রাষ্ট্রের মুজিযা বা Miracle হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খোদা যেমন নিজের অসীম শক্তি ব্যবহার করে নিজের বানানো নিয়ম ভঙ্গ করার মাধ্যমে মূলত নিজেরই শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, মানুষকে দেখান যে, তিনি আইন বানাতেও পারেন আবার সেই আইন ভাঙতেও পারেন; তেমনই রাষ্ট্রও বিশেষ অবস্থায় (যেমন: যুদ্ধ বা দুর্যোগে) নিজের বানানো আইন রহিত করে নিজেরই শক্তি, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের জানান দেয়।[9]

## আইন প্রণয়ন ও সহিংসতা (Legislation & Violence)

সার্বভৌমত্বের পর রাষ্ট্রের তৃতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো আইন প্রণয়ন। এটি মূলত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ইচ্ছা (Sovereign Will) থেকেই উৎসারিত হয় এবং তার অস্তিত্বকে বাস্তব রূপ দান করে। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই সঠিক অর্থে রাষ্ট্র হতে পারে না। কারণ, আইন

[9] Carl Schmitt, Political Theology, 36

প্রণয়নের মাধ্যমে সার্বভৌম ইচ্ছার বাস্তব প্রতিফলনের দ্বারাই রাষ্ট্র খোদার মতো হুকুম দানকারী সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

Hans Kelsen রাষ্ট্রের তিনটি মৌলিক উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন।[10]

১. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory)

২. জনগণ (Population)

৩. ক্ষমতা (Power)।

এই তিনটি বৈশিষ্ট্য মেনে নেওয়ার দ্বারা মূলত রাষ্ট্রকে দুটি অধিকার দেওয়া হয়।

১. রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা (Political Will) হিসেবে আইন প্রণয়নের অধিকার।

২. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেই আইন প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগের অধিকার।

আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র সংঘবদ্ধতার এমন একটি বিশেষ রূপ, যা আইন ও প্রশাসনের অস্তিত্বের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে। অর্থাৎ যখন কোনো রাষ্ট্রে আইন ও প্রশাসন অস্তিত্ব লাভ করে, তখনই মূলত রাষ্ট্রের প্রকৃত জন্ম হয় এবং রাষ্ট্রই এমন একটি আইনি সত্তা হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে মানুষের সংঘবদ্ধতার সামাজিক ও আইনি প্রকাশ ঘটে। তাই, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থা—দুটো মূলত একই জিনিস। একটির অস্তিত্ব অন্যটির অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। কেলসেনের মতে, 'রাষ্ট্র নামক সংঘবদ্ধতা

[10] Hans Kelsen, General Theory of Law & State, 207

নিজেই আইন।' সহজ ভাষায় বললে, রাষ্ট্র যদি সার্বভৌম হয়ে থাকে, তাহলে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সেই সার্বভৌমত্বের প্রকাশ ঘটে এবং সেই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সার্বভৌমত্বের বাস্তবায়ন হয়। রাষ্ট্র ও আইন যেহেতু নিজেরাই একে অপরকে সৃষ্টি করে এবং এই সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে একে অপরকে অস্তিত্ব দান করা, তাই আইন বাস্তবায়নের জন্য কতটুকু বলপ্রয়োগ করা হবে, সেটাও খোদ রাষ্ট্রই ঠিক করে। তাই, রাষ্ট্রে যদি কখনো কোনো খোদায়ী বিধানও বাস্তবায়ন করা হয়, সেটাও রাষ্ট্রের এই ক্ষমতার বাস্তবায়নের জন্যই করা হয়। অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্রে শরঈ আইন বাস্তবায়ন করা হলেও তা এ জন্য হয় না যে, সেটা আল্লাহর ইচ্ছা; বরং এ জন্য হয় যে, এটা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ইচ্ছা। মোটকথা, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্র খোদায়ী বিধানের মুখাপেক্ষী না; বরং খোদায়ী বিধানই রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্র ফিরআউনের মতো নিজেকেই সর্বশক্তিমান খোদা বলে ঘোষণা দেয়।[11]

## আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা (Bureaucratic Management)

আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বলতে এমন প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা উদ্দেশ্য, যা সুনির্ধারিত কাঠামোর ওপর গড়ে ওঠে এবং সমাজের গঠনপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক পারস্পরিক বিষয়গুলোকেই নিয়ন্ত্রণ করে না; বরং সমাজের একটি চিন্তাকাঠামো হিসেবে আবির্ভূত হয়ে সামাজিক মনোভাবকেও নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর আকৃতিদান করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজের মধ্যে কিছু চিন্তাধারা ও মনোভাবকে যেমন

[11] Wael Hallaq, Impossible State, 27-29

তৈরি করে এবং লালন করে, একইভাবে কিছু কিছু চিন্তা ও মনোভাবকে দমনও করে। এর ফলে সমাজে এমন অনেক চিন্তা-দর্শন ও মনোভাবও জন্ম নেয়, যা কখনোই সমাজের অংশ ছিল না।[12] বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডগলাস নর্থ (Douglass North) প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন—

'প্রতিষ্ঠানগুলোই সমাজে খেলার নিয়ম ঠিক করে। কেতাবি ভাষায় বললে, প্রতিষ্ঠান হলো মানুষের বানানো এমন কিছু নিয়ম-কানুন, যা 'মানুষের আচার-আচরণ কেমন হবে' তা ঠিক করে এবং রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের মনোভাব ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে।'[13]

এই প্রতিষ্ঠানগুলো যদিও সমাজেরই কিছু মানুষের চিন্তা থেকে অস্তিত্ব লাভ করে, তবু তা শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কারণ, মেশিনের কলকব্জার মতো প্রতিষ্ঠান বিচ্ছিন্ন কোনো জিনিস নয়; বরং স্বতন্ত্র পরিচয়ের অধিকারী স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সত্তা। মানুষের মতো এ সব প্রতিষ্ঠানেরও লাভ-ক্ষতি, বিস্তৃতি-সম্প্রসারণ ও টিকে থাকার আগ্রহ ও অনুভূতি থাকে। আর এ সব অনুভূতির কারণেই প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজে বিশেষ বিশেষ চিন্তাচেতনা ও মূল্যবোধের সমর্থন ও প্রচার করে, অন্যদিকে আপন অস্তিত্বের বিরোধী মূল্যবোধ ও চিন্তা দমন করে থাকে।[14]

---

[12] Hodgson, Geoffery M., What are institutions?, Journal of Economic Issues, volume 40, issue 1, 2016, New York, Routledge, 1-5

[13] North, Douglass C. Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, Cambridge, pp 12

[14] Javaid, Omar, Methodology of Institutional Analysis and its Implication on Expectations from the Contemporary Framework of

সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনারই সফল বাস্তবায়ন হয় আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য শুধুই প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক সাজানো গোছানো কোনো ব্যবস্থাপনা (Organization) না; বরং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) নীতি-আদর্শের ওপর গড়ে ওঠা বিশেষ প্রশাসনিক কাঠামো উদ্দেশ্য। এই কাঠামো অধীনস্থদের জন্য নিয়ম কানুন ও ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট একটি শ্রেণিবিন্যাস ঠিক করে দেয়, অধীনস্থ সকল কর্মকর্তাকেই সেই শ্রেণিবিন্যাস মেনে চলতে হয়। [কাকে সম্মান করতে হবে, কে কতটুকু সম্মান পাবে, কে উঁচু আর কে নিচু—তা ঠিক করে দেওয়া হয় এই শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে। যেমন: সরকারি অফিসের পরিচ্ছন্নতাকর্মী, পিয়ন, অফিস সহকারী, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রধান কর্মকর্তা ইত্যাদি] এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জন্মও হয়েছে ইউরোপে। এনলাইটেনমেন্টের সুবাদে ইউরোপে যখন নবজাগরণ শুরু হয়েছিল এবং ধর্মকে ছুঁড়ে ফেলে ইউরোপ যখন সেকুলার ও পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিচ্ছিল, সে সময় এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জন্ম। ইউরোপের পুরোনো ধর্মভিত্তিক সমাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তার অনুষঙ্গ হিসেবে ধর্মভিত্তিক সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তার স্থানে জন্ম নিয়েছিল 'মার্কেট সোসাইটি'[15] (বাজারভিত্তিক সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস)'।

---

Islamic Banks, Humanomics, Vol. 31 No. 2, 2015, Leeds, UK: Emerald Publishing, pp. 183-200

[15] মার্কেট সোসাইটি বা বাজারভিত্তিক সমাজ হলো এমন সমাজ, যেখানে পণ্য উৎপাদনের ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করা হয়। সহজ ভাষায়, যে যত টাকা-পয়সার মালিক, সে তত সম্মানিত এবং এর ভিত্তিতেই

ধর্মভিত্তিক সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সমাজে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল, তা পূরণ করার জন্যই আধুনিক রাষ্ট্রের এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপীয়ানরা নিজ নিজ উপনিবেশে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিবর্জিত এই ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ছড়িয়ে দেয়। উপনিবেশগুলোতে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে একদিকে তারা পশ্চিমা ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেয়, সেই সাথে তারা নিজ নিজ উপনিবেশে আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর ভিতও তৈরি করে দেয়।

প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার আরেকটি দিক হলো প্রতিষ্ঠানসমূহের বিন্যাস (Systemization)। এই বিন্যাসের ফলে খোদ রাষ্ট্রের ওপর প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশেষ নিয়ন্ত্রণ থাকে। আমলাতন্ত্রের সব শাখাই নিয়ন্ত্রিত হয় তার ওপরের শাখা দ্বারা। ফলে যে যত উচ্চপদের অধিকারী, তার নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা তত বেশি। এভাবে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ ও কন্ট্রোলের একটি সুবিন্যস্ত ধারা ও কাঠামো গঠিত হয়। এর ফলে আমলাতন্ত্র একই সময় রাষ্ট্র যন্ত্রের একটি যন্ত্রাংশ এবং রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। আধুনিক রাষ্ট্রে প্রশাসন মূলত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও বলপ্রয়োগের ক্ষমতাকে সুসংহত করার কাজ করে। আমলাতন্ত্রের এই প্রভাব ও ক্ষমতার কারণে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তার বেশ শক্তিশালী অবস্থান থাকে; বরং সমাজকে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে গড়ে তোলার জন্য আমলাতন্ত্রের কাছে সাংস্কৃতিক প্রভাবও থাকে। সমাজকে রাষ্ট্রের মনোমতো গঠন করার জন্য আমলাতন্ত্র নিজের বহুমাত্রিক শক্তি ব্যবহার

---

মানুষের সামাজিক অবস্থান নিরূপণ করা হয়। এখানে ধার্মিকতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি ভালো গুণের কোনো মূল্যায়ন থাকে না। -অনুবাদক

করে। রাষ্ট্রের মৌলিক প্রশাসনিক বিন্যাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন আইন ব্যবহার করে সমাজের মানুষকে 'নাগরিক' (Citizen) হিসেবে নতুন একটি যৌথ পরিচয় দান করে।[16]

## নাগরিকত্ব (Citizenship)

রাষ্ট্রের মৌলিক একটি উপাদান হলো সার্বভৌম ইচ্ছা বা (Sovereign Will)। এর অপরিহার্য একটি দাবি হলো, রাষ্ট্র একচ্ছত্র সাংস্কৃতিক প্রভাবের মালিক হবে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র ছাড়া অন্য সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব নির্মূল করা হবে। এ কারণেই ইউরোপে রাষ্ট্র যতই শক্তিশালী হয়েছে, অন্যান্য প্রভাবক ততই দুর্বল হয়েছে। ধর্ম, বংশ, গোত্র, পরিবার ও অন্যান্য যত মানদণ্ড ছিল, যার মাধ্যমে সমাজের মানুষ নিজেদের মধ্যে উত্তম-অনুত্তম ও উঁচু-নিচুর শ্রেণিবিন্যাস করত, তা একসময় হারিয়ে গিয়েছে। এর কারণ একটাই—নিজ সীমানার মধ্যে রাষ্ট্র কখনো প্রভাবশালী কোনো আদর্শ বা সত্তার উপস্থিতি মেনে নেয় না।[17] ঔপনিবেশিক আমলে পশ্চিমারা 'তৃতীয় বিশ্বে' যে রাষ্ট্রগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেগুলো শুধু নামকাওয়াস্তেই রাষ্ট্র ছিল। কারণ, তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলোতে তখনো ধর্ম, বংশ, গোত্রের মতো প্রভাবশালী অনেক আদর্শ ও সত্তা সগৌরবে বিরাজমান ছিল এবং সামাজিকভাবে এগুলোই ছিল মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার প্রধান উদ্দীপক। এগুলোর তুলনায় রাষ্ট্র খুব একটা শক্তি ও প্রভাব অর্জন করতে পারেনি।

[16] Hallaq, Impossible State, 30-31

[17] Hallaq, Impossible State, 32-34

সংজ্ঞা অনুযায়ী নাগরিক (Citizen) হলো একটি জাতীয়তাবাদী পরিচয়, তাই এর উৎসমূল জাতি (Nation)-এর সাথে তার অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। রাষ্ট্রকে যদি জাতির নিদর্শন এবং জাতীয়তাবাদকে যদি রাজনীতির বিশেষ একটি ধরন হিসেবে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে নাগরিককে রাজনৈতিক অস্তিত্ব হিসেবে ধরা যায়। এর ফলাফল হলো, নাগরিক নিজের ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ নাগরিকত্বকে রাষ্ট্রের মালিকানা মনে করবে, কারণ তার নাগরিকত্বের এই পরিচয় তো রাষ্ট্রই তাকে দিয়েছে এবং রাষ্ট্রের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকবে। রাষ্ট্রের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার এই ধারণা সম্পর্কে পল কান লিখেছেন—

'জীবন-মৃত্যুর মালিকানা কেবলই রাজনৈতিক শক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রের হাতে থাকে। (নাগরিকের মধ্যে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক পরিচয় তৈরির) কাজ তখনই পূর্ণতা লাভ করে, যখন নাগরিক রাষ্ট্রের জন্য জান নিতে এবং জান দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সুতরাং আধুনিক রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থে তখনই পরিপূর্ণ রাষ্ট্র হতে পারে, যখন সে নিজ নাগরিক থেকে আত্মত্যাগ ও কুরবানী চায় এবং নাগরিকও রাষ্ট্রের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে রাজি হয়ে যায়। তাই, কোনো রাষ্ট্রে জন্ম নেওয়ার দ্বারাই 'নাগরিকত্বের' উদ্দেশ্য হাসিল হয় না, নাগরিকদের মধ্যে যখন রাষ্ট্রের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার চেতনা জাগ্রত হয়, তখনই নাগরিকত্বের ধারণাটি পূর্ণতা লাভ করে।'[18]

জাতীয়তাবাদ, শৃঙ্খলা ও শিক্ষার ক্রমাগত প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে নাগরিকদের মধ্যে রাষ্ট্রের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার এই মানসিকতা প্রবেশ করানো হয়। একদম শৈশব থেকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মিডিয়ার

[18] Kahn, Putting Liberalism, 238–239.

মাধ্যমে সার্বক্ষণিক প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। এভাবে শিশু নাগরিকের মনমস্তিষ্কে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতীকের সম্মান এবং দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার জযবা তৈরি করা হয়।

## শেষ কথা

আধুনিক রাষ্ট্র একটি রাজনৈতিক কাঠামো। ইউরোপে রেনেসাঁ ও এনলাইটেনমেন্টের সময় উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতির অনিবার্য ফল হিসেবে একটি প্রতিষ্ঠান রূপে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। সম্রাট ও গীর্জার দ্বন্দ্ব, গীর্জার জোরজবরদস্তি, জুলুম ও অযোগ্যতা; এর প্রতিক্রিয়ায় ধর্ম ও রাজনীতির বিভাজন এবং খোদার পরিবর্তে মানুষের সার্বভৌমত্বের আত্মপ্রকাশ—এ সব কিছুর সারনির্যাস ও রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ হলো এই রাষ্ট্র। এটা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, সেকুলারিজমের গর্ভ থেকেই আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বিচারে এটি নিরেট একটি নাস্তিক সত্তা।

রাষ্ট্র যদি কালিমা পড়ে ইসলামের পোশাক গায়ে জড়ায় এবং তথাকথিত এই 'ইসলামী রাষ্ট্র' ইসলামী শাসন জারি করে, সেটা 'আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সামনে আত্মসমর্পণ' করার কারণে নয়; বরং রাষ্ট্রের জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা বা কালেক্টিভ উইলের কারণে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক একটি তফাত হলো, আধুনিক রাষ্ট্র নিজের সার্বভৌমত্ব প্রমাণ করার জন্যই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অন্যদিকে খিলাফত বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা মুসলিমদের দ্বীনি ও দুনিয়াবি সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধি হিসেবে শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থাকতে বাধ্য থাকে। আধুনিক রাষ্ট্র নিজের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সর্বব্যাপী ও কঠোর আইন ব্যবহার করে, অন্যদিকে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা শরীয়তের অনুগত থেকে আহকামের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ ও ভিন্নতাকে স্বীকার করে।[19] আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নাগরিক হিসেবে সকলের এই যৌথ পরিচয়ই একমাত্র পরিচয় হিসেবে স্থান পায় আর ধর্ম, বংশ ও গোত্রের মতো অন্য সামাজিক পরিচয়গুলো হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথবা একেবারে দুর্বল হয়ে যায়। এভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের ধর্ম, বংশ ও গোত্রের পরিচয়গুলো বিলুপ্ত করে সকলের

[19] শরীয়ত ও আধুনিক রাষ্ট্রের আইন (Law) সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি সত্তা। শরীয়ত বা ফিকহ হলো ইসলামের মূল টেক্সট বা নুসুস থেকে আহরিত জ্ঞান, অন্যদিকে আইন হলো রাষ্ট্র ও মানুষের সার্বভৌমত্বের নিদর্শন। আইন সাধারণত মানুষ নিজেরাই বানায়, তাই আইনগুলো অগভীর হয়ে থাকে, তাতে পক্ষপাতিত্ব থাকে। অনেক সময় অনৈতিক বিষয়ও আইন হিসেবে বাস্তবায়ন হয়। অন্যদিকে শরয়ী আহকামের উৎস হলো ওহী, যা সব ধরনের পক্ষপাত থেকে পবিত্র, মানবজীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ নৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। শরীয়তের কোনো বিধানই অনৈতিক হয় না। রাষ্ট্রের আইনের নৈতিক কোনো ভিত্তি না থাকায় মানুষের মনেও সেই আইনের প্রতি কোনো শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। ফলে আইন থাকলেও মানুষ তা মেনে চলে না। মানুষকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করার জন্য তাই পেশিশক্তি ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর রাষ্ট্র সেটা করে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে—পুলিশ, আদালত ইত্যাদি দিয়ে। অন্যদিকে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা শরঈ বিধান বাস্তবায়নের জন্য পেশিশক্তির চেয়ে ইসলাহে নফস ও আত্মশুদ্ধির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ব্যক্তি ও সমাজের আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের প্রতি ইসলামী শাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব থাকে বেশি। আত্মিক পরিশুদ্ধির ফলে ব্যক্তি ও সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শরঈ বিধানের প্রতি অনুগত থাকে। চাপপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। আধুনিক রাষ্ট্রের আইনের সাথে নৈতিকতার এই দূরত্ব এবং আত্মিক পরিশুদ্ধির (Technologies of the Self) ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য ওয়ায়েল হাল্লাক রচিত Impossible State বইটি দেখা যেতে পারে।

একক পরিচয় (নাগরিক) তৈরি করা হয় এবং ধর্মহীন সমাজ জন্মলাভ করে। এই পুরো বিষয়টিই ইসলামী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আধুনিক রাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি, কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং এর প্রভাব—সব দিক দিয়েই এটি ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। দ্বীনি আন্দোলনের কর্মী ও দাঈরা তো দূরের কথা, একজন সাধারণ মুসলিমের পক্ষেও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গ্রহণ করা সম্ভব না। দুঃখজনক বিষয় হলো, আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা নিজেদের চিন্তাদর্শন দিয়ে বানানো রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ধারণাগুলোকে মানব সভ্যতার স্বাভাবিক বিবর্তন হিসেবে উপস্থাপন করে আমাদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে আর সাধারণ মানুষের সাথে সাথে বড় বড় চিন্তাশীল ব্যক্তিও তাদের ফাঁদে পা দেন। প্রতারিত হওয়ার এই সংস্কৃতির কারণেই বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, রাজনৈতিক কাঠামো বা শাসন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করলে রাষ্ট্র নামের এই কাঠামোর কথাই সবার আগে আমাদের মাথায় এসে হাজির হয়; খিলাফত, ইমারত বা পূর্ব-আধুনিক (Pre-modern) যুগের শাসন ব্যবস্থাগুলো তো আমাদের কাছে একেবারেই অজানা-অচেনা হয়ে গিয়েছে। আরও বড় কষ্টের বিষয় হলো, যারা দ্বীন কায়েমের দরদ রাখেন, এমন নেতৃবৃন্দ আধুনিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি, বাস্তবতা, বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি এবং এর প্রভাব সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন না; খিলাফত ও ইমারতের প্রকৃত রূপকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টাও করেন না; বরং উলটো তারাই ধর্মপ্রাণ মুসলিমদেরকে তথাকথিত 'ইসলামী রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখান।

পরিশেষে পাঠকদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই লেখার ভুলত্রুটিগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং লেখাটিকে দ্বীনের দাঈদের খেদমতে রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে আরও গভীরভাবে চিন্তা করার দাওয়াত হিসেবে বিবেচনা করবেন। আশা করি তাঁদের কলম ও কলব থেকে এ বিষয়ে ভবিষ্যতে জ্ঞানগর্ভ গবেষণা সামনে আসবে আর আমার এই লেখাটি সেই ঘন বর্ষণের পূর্বে ছোট্ট একটি বৃষ্টিফোঁটা হিসেবে নিজের ভূমিকা পালন করবে।

# কাফেরদের অর্থনৈতিক বয়কট | চতুর্থ পর্ব

*আধুনিক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইসলামী বয়কট : ইসলামবিরোধী চলমান বিশ্বব্যাপী ইহুদি-জায়নবাদী আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে ইসলামী বয়কটকে বোঝা, তা বাস্তবায়ন করা এবং তার প্রতি আহ্বান জানানো*

**মুহাম্মাদ ইবরাহীম লুডউইক**

*[মুহাম্মাদ ইবরাহীম লুডউইক (আল্লাহ তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করুন আমীন) একজন নওমুসলিম আলিম। তিনি আরব বিশ্বের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেছেন। কুফরী সমাজ ও ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করেই তিনি সেসব ব্যবস্থার চক্রান্ত ও মেকানিজম প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা মিথ্যা বলে চিনে নিয়েছেন। পরে ঈমান কবুল করে ধন্য হয়ে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেছেন, হককে পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং তার দাঈ হয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি কুফরের বিরুদ্ধে লড়াইরত মুজাহিদদের সমর্থক ও রক্ষকও হয়ে ওঠেন—আমরা তাঁকে এমনই মনে করি, আল্লাহই তাঁর হিসাব নেবেন এবং আল্লাহর সামনে কাউকে পবিত্রতার প্রশংসাপত্র দেওয়া যায় না।*

*নিজের ভাষায় তিনি বলেন:*

*“আমার নাম মুহাম্মাদ ইবরাহীম লুডউইক (জন্মনাম: আলেকজান্ডার নিকোলাই লুডউইক)। আমার জন্ম আমেরিকায়। আমি ইতিহাস, সমালোচনামূলক সাহিত্য, সভ্যতাবিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন,*

*রাজনৈতিক দর্শন, উপনিবেশ-উত্তর দর্শন, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি—এসব বিষয়ে আমেরিকা ও জার্মানিতে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। এসব অধ্যয়নের মধ্যে আমি বিশ্বের জটিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে গবেষণা করি। এ গবেষণার মাধ্যমে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা প্রকৃত অর্থে এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে এসব সমস্যার সমাধান ধারণ করে। এ উপলব্ধির ফলেই ১৪৩৩ হিজরীর রমযান মাসে আমি ইসলাম গ্রহণ করি।"*

*আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং আমাদের প্রিয় ভাই মুহাম্মাদ ইবরাহীম লুডউইককে হকের উপর অটল রাখুন, আমীন। আধুনিক পুঁজিবাদ, সেক্যুলারিজম, গণতন্ত্র, ইকামাতুদ্দীন ও খিলাফতের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর রচনাসমূহ বিশেষভাবে উপকারী।*

*'নাওয়ায়ে গাজওয়ায়ে হিন্দ' পত্রিকা তাঁর ইংরেজি রচনা Islamic Boycotts in the Context of Modern War এর অনুবাদ প্রকাশ করছে। - সম্পাদক]*

## বয়কটের কর্মপদ্ধতি

বয়কটের ফরযিয়্যাত ও গুরুত্ব বোঝার পর এখন এর বাস্তবায়নের পদ্ধতির দিকে নজর দেওয়া দরকার। যেমন প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হলো নিয়তের সংশোধন, এখানেও একই কথা প্রযোজ্য।

নিয়ত পুনর্নবীকরণ : বয়কট অর্থনৈতিক যুদ্ধের একটি অংশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ

“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সেই আমলই কবুল করেন, যা একমাত্র তাঁর জন্য খাঁটি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়।” (সিলসিলা সহিহা: ২২১৭)

আরেকটি হাদীসে তিনি বলেন:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।” (সহীহ বুখারী: ১)

অতএব, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়ত শুদ্ধ করার পাশাপাশি বয়কটের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বোঝা আমাদের জন্য সহায়ক হবে।

বয়কট অর্থনৈতিক যুদ্ধের অস্ত্রসমূহের একটি। অথচ অর্থনৈতিক যুদ্ধ পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের কেবল এক দিক। পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে গোয়েন্দা যুদ্ধ, মানসিক যুদ্ধ, রাজনৈতিক যুদ্ধ, সরাসরি যুদ্ধ, ইলেকট্রনিক যুদ্ধ—সবই অন্তর্ভুক্ত। কোনো সামরিক অভিযানকে যদি একটিমাত্র অস্ত্রের ব্যবহারে সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে তা যেন এমন কারো মতো হবে, যে কেবল হাতুড়ি দিয়ে একটি বাড়ি বানাতে চায় অথচ অন্য সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে।

আজকের বিশ্বে বয়কটকে কাফেররা একটি ‘অহিংস প্রতিরোধ’ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে। যে মুসলমানেরা বয়কটে অংশ নেন, তাঁদের উচিত এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত থাকা। আল্লাহ তাআলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন:

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم

“ইহুদী-খ্রিস্টানরা কখনোই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মকে অনুসরণ কর।” (সূরা বাকারা ০২:১২০)

সুতরাং, তারা কেবল সেই মুসলমানের প্রতি খুশি, যে প্রতিরোধকে সীমাবদ্ধ রাখে শান্তিপূর্ণ মিছিল ও বয়কটে। এ ধরনের 'অহিংস প্রতিরোধ'-এর দর্শন আসলে গান্ধীর অনুসৃত, যা আধুনিক গণতন্ত্র নামক নতুন ধর্মের একটি মৌল নীতি। উপসাগরীয় অঞ্চলের কিছু খ্যাতনামা মুনাফিক প্রকাশ্যেই বলে থাকে যে, ফিলিস্তিনিদের নাকি তাদের অধিকার আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় বেছে নেওয়া উচিত। কিন্তু মুসলমানদের জন্য এ ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট—দখলদার ইহুদী ও আমেরিকান রাষ্ট্রগুলোর মুসলিম ভূখণ্ডে লুটপাট ও আগ্রাসনের জন্য যে অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োজন, তা ভেঙে দেওয়া। সেসব সম্পদপ্রবাহ রোধ করা, যা কাফেরদের যুদ্ধযন্ত্রকে জ্বালানি জোগায়। মুনাফিক ও মুরতাদ সরকারগুলোর পতন ঘটানো, যারা কাফেরদের আশীর্বাদে মুসলিম ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মুসলিম ভূমিগুলোকে কাফেরদের অর্থনৈতিক নির্ভরতা থেকে মুক্ত করা। কাফের সংস্কৃতির বিধ্বংসী প্রভাব মুছে দিয়ে ইসলামী পরিচয়কে পুনর্জীবিত করা। নিয়ত সঠিক হলে ছোট্ট একটি কাজও আখিরাতে বিপুল সাওয়াব বয়ে আনতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি কেবল ধনসম্পদ অর্জনের জন্য পরিশ্রম করে, তবে সে কেবল ধন-সম্পদই পাবে। কিন্তু যদি সে এ নিয়তে পরিশ্রম করে যে, এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি আল্লাহর ইবাদতে আরও মনোযোগী হতে পারবে, পরিবার-পরিজনের হক আদায় করতে পারবে এবং মুসলিম উম্মাহকে উপকৃত করতে পারবে, তবে তার এ পরিশ্রম ইবাদতে রূপান্তরিত হবে এবং ইনশাআল্লাহ সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হবে।

এমনই অবস্থা বয়কটের ক্ষেত্রেও। যদি আমরা একে কেবল জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম হিসেবে ধরি, তবে সর্বোচ্চ ফলাফল হবে একটি জাতির মুক্তি। কিন্তু যদি একই কাজ আমরা এ নিয়তে করি যে, এটি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী মুমিন ভাই-বোনদের সহায়তা এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অংশ, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ আমলের সাওয়াব পাওয়া নিশ্চিত।

নিয়তের সঠিক হওয়ার আরেকটি উপকার হলো—যে কাজে উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকে, তা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। আমরা যদি গভীরভাবে বুঝি যে বয়কট কীভাবে বৃহত্তর লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হতে পারে, তবে আমাদের সংকল্প দৃঢ় হবে এবং তা বাস্তবায়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে।

অতএব, যদি আমরা বয়কটকে একটি যুদ্ধকৌশল হিসেবে দেখা শুরু করি, তবে তা আমাদের চিন্তাধারাই বদলে দেবে। বর্তমানে বহু মুসলমান কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ককে পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে দেখে, অথচ বাস্তবে তা একতরফা শোষণ ছাড়া কিছু নয়। আর এই অসমতাই কাফেরদের শক্তির উৎস। সচেতন বয়কট কেবল এই অবিচারের স্মারক নয়, বরং তা দূরীকরণের দিকে একটি কার্যকর পদক্ষেপও বটে।

## অগ্রাধিকার নির্ধারণ

আজ যখন আমরা বয়কট বাস্তবায়নের কথা বলি, তখন নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ সামনে এসে দাঁড়ায়। মানসিক ও বস্তুগত দাসত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ইসলাম বিদ্বেষীদের পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা প্রায়

অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাই জরুরি হলো—অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা। এ নীতি ঠিক সেই ফিকহি মূলনীতিরই প্রতিফলন যেখানে বলা হয়েছে:

إذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى فعل أحدها قدم الأخف منها

"যখন দুটি মন্দ একসাথে সামনে আসে এবং একটি গ্রহণ করাই অনিবার্য হয়, তখন হালকা মন্দটিকেই বেছে নিতে হবে।"

আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে, সবকিছুর বয়কট করা সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে এমন চেষ্টা সুফলের চেয়ে কুফলই ডেকে আনে। তাই বয়কট মানে প্রায়শই—দুই মন্দের মধ্যে কম মন্দটিকে বেছে নেওয়া।

প্রায়শই মুসলমানেরা বয়কটের সময় ঐ সমস্ত কোম্পানিকে টার্গেট বানায়, যারা প্রকাশ্যে ফিলিস্তিনে ইহুদী আগ্রাসনের পক্ষে দাঁড়ায়। এটি অত্যন্ত সীমিত প্রভাব রাখে। অথচ বয়কটের প্রকৃত লক্ষ্য হলো—প্রথমত, সেই অর্থনৈতিক উৎসগুলো বন্ধ করা যা আমাদের নির্যাতিত ভাইবোনদের বিরুদ্ধে জুলুমের জ্বালানি যোগায়। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ। আর এই লক্ষ্যগুলো কেবল পানীয়ের বোতল বা খাবারের ব্র্যান্ড বদল করে অর্জন করা সম্ভব নয়।

সত্য হলো—ইহুদীবাদীদের দখলে রয়েছে বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবস্থা, যার ভেতরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প-কারখানা, বাণিজ্য সবই জটিলভাবে জড়িত। জাতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো তারই উপাদান মাত্র। তাই বয়কটের প্রকৃত লক্ষ্য হতে হবে পুরো বৈশ্বিক দাজ্জালি ব্যবস্থা—কেবল কোনো দেশ বা কোম্পানি নয়।

## ইহুদীবাদীদের নিয়ন্ত্রিত বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থা

বিশ্ব অর্থনীতির ওপর আধিপত্য কায়েম করাই সেই প্রধান অস্ত্র, যার মাধ্যমে ইহুদীবাদী ও তাদের মিত্ররা পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিকে নিজেদের প্রভাববলয়ে আবদ্ধ রেখেছে। মুসলমানেরা যতক্ষণ না এই ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে তার মোকাবিলা করবে, ততক্ষণ তারা কাফেরদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। কিন্তু এর মোকাবিলা করার আগে, এর প্রকৃতি বোঝা জরুরি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই ব্যবস্থা এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি, যারা ব্যক্তি ও সংগঠনের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। যারা তাদের আনুগত্য স্বীকার করে, তাদের পুরস্কৃত করা হয়; আর যারা অস্বীকার করে, তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। এর মধ্যে আছে—কেন্দ্রীয় ব্যাংক, উন্নয়ন ব্যাংক, স্টক এক্সচেঞ্জ, আন্তঃব্যাংক নেটওয়ার্ক, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার, বীমা কোম্পানি, ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি এবং জাতিসংঘের সংস্থা ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যুক্ত জাতীয় সরকার ও কর্পোরেট কোম্পানিগুলোও এই ব্যবস্থার অংশ হয়ে যায়। সব মিলে তারা এক ধরনের 'অর্থনৈতিক জোট' গঠন করেছে, যেখানে সবাই একে অন্যকে সমর্থন দিয়ে থাকে।

কোকা-কোলা ও পেপসিকে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি। অথচ উভয়ের টাকা একই ব্যাংকিং ব্যবস্থায় থাকে এবং ব্যাংকগুলো আবার একে অন্যকে ঋণ দেয়। যেমন—পেপসির ব্যাংকের প্রয়োজন হলে কোকা-কোলার ব্যাংক তাকে ঋণ দিতে পারে, আবার উল্টোটা-ও ঘটে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, যদি ইন্দোনেশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিপদে পড়ে, তবে অন্য দেশ ও বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান যেমন আইএমএফ বা ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে। যদি কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি বা রাষ্ট্র এই

ব্যবস্থার নীতি মানতে অস্বীকার করে, তবে তাকে বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া হয়—যেমন অর্থ ও সম্পদে প্রবেশাধিকার সীমিত করা, ক্রেডিট রেটিং নামিয়ে দেওয়া, জরিমানা বা অবৈধ ঘোষণা করা। এমনকি গোপন পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়, যেমন কোনো মুদ্রা বা শেয়ারে কাল্পনিক আক্রমণ—অর্থাৎ হঠাৎ বিপুল ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দাম নামিয়ে দেওয়া। ফলে যারা অর্থপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, তারা কেবল পৃথক রাষ্ট্রের অর্থনীতিই নয় বরং পুরো বৈশ্বিক ইহুদীবাদী অর্থব্যবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। যদি বয়কটের ফলে কোনো একটি কোম্পানি বা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তারা অন্য উৎস থেকে সেই ঘাটতি পূরণ করে ফেলে। এই ব্যবস্থা একটি দেহের মতো—এক অঙ্গকে আঘাত করলে বাকিগুলো তাকে রক্ষা করতে ছুটে আসে। তাই কেবল কোনো কোম্পানি বা রাষ্ট্রকে টার্গেট বানানো যথেষ্ট নয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“তোমরা সবাই মিলে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যেমন তারাও সবাই মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথেই আছেন।” (সূরা আত-তাওবা: ৩৬)

অতএব, কার্যকর বয়কটের জন্য প্রয়োজন—এই পুরো বৈশ্বিক ইহুদীবাদী অর্থব্যবস্থা ও তার সাথে যুক্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করা; যেমন কাফেররা শক্তি প্রয়োগ করে শরীয়ত ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বয়কট করে।

## একটি সাধারণ উদাহরণ

ধরুন, একজন মুসলিম Danone দই বয়কট করে Almarai (সৌদি ব্র্যান্ড) কিনলেন। উপরিভাগে মনে হবে টাকা এবার পশ্চিমে না গিয়ে মুসলিম ব্যবসায়ীর হাতে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে Almarai-র যুক্তরাষ্ট্রে জমি আছে যেখানে পশুখাদ্য উৎপাদিত হয়, যন্ত্রপাতি আসে পশ্চিম থেকে, তারা ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। ফলে তাদের অর্থও শেষমেষ বৈশ্বিক ইহুদীবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই প্রবাহিত হয়। মুসলিম দেশগুলোর বড় ব্যবসায়ীরা পশ্চিমা গাড়ি, বিমান, আসবাবপত্র, শিক্ষাব্যবস্থা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। তাদের ট্যাক্সের অর্থ দিয়েই সরকার পশ্চিমা অস্ত্র কেনে, পরামর্শক নিয়োগ করে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ায়—যা মূলত ডলার ও ইউরোতেই সীমাবদ্ধ। এভাবে শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যবস্থাই আমেরিকান অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তোলে—আর আমেরিকার শক্তিই ইহুদীবাদীদের অস্তিত্বের প্রধান ভরসা। প্রায় প্রতিটি দেশই এই ব্যবস্থায় জড়িয়ে আছে। সাদ্দাম হোসেন ও মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে হত্যা করা হয়েছিল এই নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কারণে। ইরান, রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়ার আন্তর্জাতিক একঘরে হয়ে পড়াও এরই ফলাফল। এ ব্যবস্থা দুনিয়াকে দাসে পরিণত করেছে; যারা এর বিরোধিতা করছে, তারাও একই ছায়ার নিচে বসবাস করছে।

তবে এর মানে এই নয় যে Danone-এর বয়কট ও Almarai কেনা একেবারেই অর্থহীন। বরং এর মধ্যেও সুফল আছে। কিন্তু প্রকৃত সুফল তখনই আসবে, যখন আমরা সমগ্র ব্যবস্থার বিরোধিতায় নামব এবং পূর্ণ স্বাধীনতার চেষ্টা করব।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—যদি এই ব্যবস্থা এতটাই সর্বব্যাপী ও প্রভাবশালী হয়, তবে আমরা কিভাবে একে চ্যালেঞ্জ করব? কিভাবে এর বাইরে বের হতে পারব?

# সোহবতে বা-আহলে দিল

## (আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতের ইতিবৃত্ত)

# উস্তায ফারুকের সাথে | একত্রিশতম আসর

মুঈনুদ্দীন শামী

## আফফান গনী শহীদ রহিমাহুল্লাহ [২]

আলহামদুলিল্লাহি ও কাফা, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া।

اللّٰهُم وفّقني كما تُحبّ وترضى، وألطف بنا في تيسير كل عسير، فإنّ تيسير كل عسير عليك يسير. آمين!

রেহান ভাই, ফারুক ভাইকে তাঁর পরিবার ও ঘরের আসবাবপত্রসহ অন্য একদিকে নিয়ে গেলেন এবং আমাকে নওআড্ডার সেই হোটেলেই রেখে গেলেন। পরে জানতে পারি, যে নতুন এলাকায় ফারুক ভাই যাওয়ার ইচ্ছে করেছিলেন সেখানে মার্কিন ড্রোনের উড্ডয়নের কারণে তিনি যেতে পারেননি। ফলে তিনি আবারও উত্তর ওয়াজিরিস্তানের খড় কামের কাছে ডোগা নামক গ্রামের সেই পুরোনো আস্তানায় ফিরে যান। ফারুক ভাইকে পৌঁছে দিয়ে রেহান ভাই আবার নওআড্ডার হোটেলে ফিরে এলেন। কয়েকদিন আমরা একসাথে সেখানেই ছিলাম।

যদিও রেহান ভাইয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অনেক দিনের, তবে প্রথমবারের মতো আলাপচারিতায় জানলাম যে তিনি আসলে ফারুক ভাইয়ের খালাতো ভাই। আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম—"আপনি কি সত্যিই ফারুক ভাইয়ের খালার ছেলে?" তিনি হেসে বললেন, "হ্যাঁ।" ফারুক ভাইয়ের জীবনের

সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এ দিকটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এত দীর্ঘ সময় আমি তার সঙ্গী হয়েও কখনো বুঝিনি যে রেহান ভাই তার আত্মীয়। রেহান ভাইয়ের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু তিনিও কখনো তা প্রকাশ করেননি। অর্থাৎ, ফারুক ভাই আমীর হয়েও তাঁর এই আত্মীয়ের জন্য কোনো বিশেষ সুবিধা রাখেননি। অপর দিক থেকে, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার গুরুত্ব এতটাই ছিল যে আমার মতো একজন ঘনিষ্ঠ সাথীও এ সম্পর্কের খবর জানতে পারিনি।

এখানে নিরাপত্তা (সতর্কতা ও গোপনীয়তা) সম্পর্কিত আরেকটি সূক্ষ্ম ঘটনা উল্লেখযোগ্য। কয়েকদিন পর আমার ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। আলাপচারিতায় রেহান ভাইয়ের কথা উঠলে আমি অবাক হয়ে বললাম, "আমার তো জানা ছিল না যে রেহান ভাই আপনার আত্মীয়!" পরে যখন ফারুক ভাই ও রেহান ভাই মুখোমুখি হলেন, তখন রেহান ভাই তাঁকে বললেন—"আপনি তো জানেন মঈনুদ্দীন নিচ থেকে (পাকিস্তানের শহরাঞ্চল থেকে) এসেছেন এবং তিনি আবারও সেদিকে ফিরে যাবেন। তাহলে কেন আপনি তাঁকে আপনার মাইজর এলাকার ঘরে নিয়ে গেলেন?" ফারুক ভাই নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং বললেন, "যে সাথিকে আবার শহরে ফিরে যেতে হবে, তাকে কখনো আমাদের প্রধান আস্তানা দেখানো ঠিক হয়নি।" তারপর তিনি রেহান ভাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, "আমি ভুল করেছি বটে, কিন্তু আপনি কেন তাঁর সামনে প্রকাশ করলেন যে আপনি আমার খালার ছেলে?" রেহান ভাই হেসে বললেন—"ফারুক ভাই আমার কথার জবাবে এমন কড়া উত্তর দিলেন যে, আমি চুপ করে গেলাম।" আসলে নিরাপত্তা কেবল কিছু নিয়ম কানুন মানার নাম নয়, বরং এটি এক ধরনের মানসিক অবস্থা—চিরসতর্ক ও সজাগ থাকার

অভ্যাস। আর এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, মানুষ যেন নিজেকে সর্বদা যুদ্ধাবস্থায় মনে করে, এমনকি যদি সে পরিবার নিয়ে শহরের আলো-ঝলমল পরিবেশেও বাস করে। যে এভাবে নিজেকে যোদ্ধার অবস্থানে কল্পনা করে, তার মন নিরাপত্তার ব্যাপারে ঘুমের মধ্যেও জাগ্রত থাকে। নিরাপত্তা—এটি ছিল ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর স্বভাবের একটি মৌলিক দিক। অতীতের আসরগুলোতেও এ দিকটি উঠে এসেছে, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতের আসরগুলোতেও বিশেষত ওয়াজিরিস্তানের শেষ সময়ের ঘটনাবলিতেও এ প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

নওআড্ডার সেই হোটেলে মালিক ও কর্মচারীদের কাছে রেহান ভাই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন— "এ আমার ছোট ভাই" এবং সত্যিই, সর্বদা তিনি আমাকে ভাইয়ের মতো স্নেহ করেছেন। কয়েকদিন আমরা একসাথে ছিলাম—কথা বলেছি বিশ্ব রাজনীতি থেকে শুরু করে ফারুক ভাইয়ের মাজমুয়া সংক্রান্ত নানা বিষয়ে। তারপর একদিন আমরা দুজন লোয়াড়া যাত্রা করলাম, যেখানে ছিল আমাদের ইলামের কেন্দ্র—যা ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত স্থায়ীভাবে চালু ছিল এবং আমাদের সংগঠন ও প্রাক-সংগঠনের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘকালীন স্থায়ী কেন্দ্র হিসেবে এটা বিবেচিত। আমরা কেন্দ্রটিতে পৌঁছলাম, যেখানে দাউদ ঘুরী ভাই ও উমর ইউসুফ ভাই অবস্থান করছিলেন। সেখানে এক-দুদিন কাটিয়ে আবার ডোগায় ফিরে এলাম। ইনশাআল্লাহ আগামী আসর শুরু হবে গত আসরে উল্লিখিত মাইজরের সফর এবং এখানেই ডোগায় ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাবলি দিয়ে। আপাতত রেহান ভাইয়ের জীবনের কয়েকটি ঝলক তুলে ধরছি।

ওয়াজিরিস্তানের শেষ এক-দুই বছরে রেহান ভাই কেন্দ্রীয় সংগঠন আল-কায়েদার আরব শায়খদের সেবাযত্ন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত নিয়োজিত ছিলেন। অপরদিকে, ফারুক ভাই জীবনের শেষ ছয় মাসে কেবল একটিমাত্র মিশন সামনে রেখেছিলেন— সাথিদেরকে, আল-কায়েদা উপমহাদেশ শাখার এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সংগঠনের শায়খ ও দায়িত্বশীলদের ওয়াজিরিস্তানের বাইরে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছিলেন। যারা ঐ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তারাও একই কাজে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত ছিলেন। রেহান ভাইও এ সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ হাড়ভাঙা খাটুনিতে ঢেলে দিয়েছিলেন। নিরলস পরিশ্রম, শত্রুর অব্যাহত হুমকি, তার ওপর ঘুমের ঘাটতি। একদিন এমন অবস্থাতেই তিনি শাওয়াল এলাকার এক মসজিদে জামাতের সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে অচেতন হয়ে পড়লেন। মুহূর্তেই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর মুখ মাটিতে আঘাত পেয়ে এতটা ফুলে উঠল যে, চেনাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল। এরপরই প্রায় এক মাসের মধ্যে ফারুক ভাই শহীদ হয়ে গেলেন। রেহান ভাই পরবর্তী দুই-তিন মাস পর্যন্ত ওয়াজিরিস্তান ছাড়তে পারলেন না। পরে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের গোমাল এলাকায় কয়েকদিন তাঁর সঙ্গে থাকার সুযোগ হলো। তখনই আমীরুল মুমিনীন মোল্লা উমর (রহিমাহুল্লাহু)-এর ইন্তেকালের খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। সে সময়ে রেহান ভাইয়ের সঙ্গে আমার একটি সংলাপ হয়েছিল, যা আগে 'উস্তাদের সাথে' আসরের এক পর্বে[20] উল্লেখ করা হয়েছে।

[20] ২২ তম পর্ব "যখন আল্লাহ কোনো কিছু চান তখন তার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে দেন।"

রেহান ভাই আফগানিস্তানের বহু ফ্রন্ট ও জিহাদি কেন্দ্রে সময় কাটিয়েছেন। কিন্তু দূরত্ব ছিল অনেক, পরিস্থিতির কারণে চিঠিপত্রের নিয়মিত আদান-প্রদানও সম্ভব হয়নি। তবে সাধারণ খোঁজখবর মাঝে-মধ্যে পাওয়া যেত। তারপর ২০১৭ সালে প্রায় দেড় বছর পর আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো এবং আমরা দশ-বারো দিন একসাথে থাকলাম। এত দীর্ঘ সময় পর সাক্ষাত হওয়ায় প্রথম ক'দিন আমরা শুধু পুরোনো স্মৃতিই ভাগাভাগি করছিলাম। তখনই আমি তাঁকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে নিজের বিবাহের খবর জানালাম। গোপন রাখার কারণ ছিল—আমাদের প্রধান শত্রু শুধু আমেরিকা নয়, বরং তার লালিত এক নিকৃষ্ট দাস, যে তার প্রভু আমেরিকার চেয়েও একনিষ্ঠভাবে কুফরকে সেবা করে—অর্থাৎ পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের গোপন সংস্থা, বিশেষত আইএসআই। এ তাগুতী প্রতিষ্ঠানগুলোর শত্রুতার কারণে তাদের প্রতিপক্ষের জীবন, ইজ্জত-আবরু বা সম্পদ কোনো কিছুই নিরাপদ নয়।

পরে তাই-ই ঘটল। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে ২০১৮ সালে আমি আইএসআই ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানের হাত থেকে সুরক্ষিত রইলাম। কিন্তু যখন তারা শহরে আমার উপস্থিতি ও বিয়ের খবর জানতে পারল, তখন তারা আমার নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে পাঁচজনকে—যাদের মধ্যে নারীও ছিলেন—গ্রেফতার করল। আমাদের ঘরে তারা উচ্ছৃঙ্খল লোকদের মতো প্রবেশ করল, পর্দা ও চাদরকে পদদলিত করল, বয়োবৃদ্ধদের হেয় করল, শিশুদের অপমান করল। যা লেখকের সঙ্গে ঘটেছিল, তা তো আসলে ওই দমন যন্ত্রের ভয়ঙ্কর অত্যাচার ও বর্বরতার সামান্য এক ঝলক মাত্র। নতুবা, ২০১১ সালে এক দাওরায়ে শরইয়ার বৈঠকে আমি নিজে শাহীদ ফারুক ভাই রহিমাহুল্লাহর মুখে শুনেছিলাম—

আইএসআই-এর গুন্ডারা এক বন্দী মুজাহিদ ভাইয়ের সামনে তার স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করেছিল (ধর্ষণ করেছিল)। সেই বীভৎস ঘটনায় ওই মুজাহিদ ভাই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং উন্মাদ হয়ে যান। এমন নিকৃষ্ট, অধম শত্রুদের পরিণতি অবশ্যই খুব শিগগির সেরকমই হবে, যেমনটা হয়েছিল লিবিয়ায় গাদ্দাফির ক্ষেত্রে। প্রতিশোধপরায়ণ রবের কাছে তো তাদের অপরাধগুলো ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হচ্ছে-ই। আল্লাহর ইচ্ছায়! আমেরিকার দোসরদের জন্য জাহান্নামের সুসংবাদ রয়েছে, আর সেটি তো এক ভয়াবহ আশ্রয়স্থল!

২০১৭ সালেই রেহান ভাইয়ের বিবাহ হয় মুসআব ভাইয়ের বড় বোনের সঙ্গে—যিনি ছিলেন শাহীদ হাফিজ সাআদ রহিমাহুল্লাহ ও শাহীদ কাতাদাহ ভাই রহিমাহুল্লাহর বিধবা। বিয়ের পর রেহান ভাই কিছুদিন আফগানিস্তানের ওয়ারদাক প্রদেশে অবস্থান করেন, এরপর ২০১৮ সালের শেষার্ধে উরুজগান এবং সেখান থেকে হেলমান্দে স্থানান্তরিত হন।

উরুজগান প্রদেশে আমি প্রায় দুই সপ্তাহ রেহান ভাইয়ের আতিথ্য গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করি। আমাদের সহকর্মীদের জন্য সেটি ছিল ভয়াবহ আর্থিক সংকটের সময়। দারিদ্র্য এমনভাবে চেপে বসেছিল যে প্রায় সবার জীবনই এক তীব্র অভাবে জর্জরিত ছিল। আল্লাহ তাআলা যেন সেই পরীক্ষার প্রতিদান থেকে কাউকে বঞ্চিত না করেন। রেহান ভাই রহিমাহুল্লাহও সেই দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তবুও তিনি আমাদের প্রতি অসীম সম্মান ও আপ্যায়ন করেছেন। তার বাড়িতে একটি কূপ ছিল, সেখান থেকেই বালতি দিয়ে পানি তুলে আনতে হতো। বাড়িতে শৌচাগার ছিল না; তাই প্রয়োজন মেটাতে নিকটবর্তী ক্ষেতে যেতে হতো। উরুজগানে রেহান ভাইয়ের সঙ্গে সেটিই আমার শেষ সাক্ষাৎ। এরপর তিনি ফারাহ, তারপর

হেলমান্দ প্রদেশে চলে যান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'কাশফ' হয়ে গেলেন। [জিহাদের ময়দানের পরিভাষায় কাশফ মানে হলো কারও পরিচয় শত্রুর কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়া এবং এরপর থেকে সে শত্রুর স্থায়ী নজরদারিতে পড়ে যায়।] রেহান ভাই একবার শত্রুর নজরে পড়ে গেলেন, আর শাহাদাত পর্যন্ত সে তাড়া থেকে মুক্তি পাননি। (কদ্দারুল্লাহু ওমা শাআ ফাআলা)—আল্লাহর ফয়সালা, যা তিনি চাইলেন, সেটিই ঘটল। পরে তিনি হেলমান্দের বিখ্যাত মুসা কালা এলাকায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই ২৪ মহররম ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে, এশার নামাযের পর মার্কিন ও আফগান সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে আমীরুল জিহাদ মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহর সঙ্গে শাহাদাত বরণ করেন।

২০১৮ সালে আমীর মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহর নির্দেশে রেহান ভাইকে আল-কায়েদা উপমহাদেশের মাকতাবুত তাওয়াসুল তথা কমিউনিকেশন ডেস্ক-এর উপ-দায়িত্বশীল করা হয়। আল-কায়েদার সব শাখাতেই এ বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সংবেদনশীল ও সর্বোচ্চ গোপনীয়তার অন্তর্ভুক্ত। আসলে বিশ্বের অন্যান্য সংগঠনেও যোগাযোগ বিভাগ এভাবেই সংবেদনশীল। তবে যেহেতু আল-কায়েদা এক জিহাদি ও গোপন সামরিক সংগঠন, তাই এর গোপনীয়তা বিশ্বের অন্যান্য অনেক গোয়েন্দা সংস্থার চেয়েও অধিক কঠোর। শত্রুর বিশেষ তাড়া রেহান ভাইয়ের প্রতি মূলত এ দায়িত্বের কারণেই ছিল। রেহান ভাই এক জন ভালো লেখকও ছিলেন। 'ফায়েজান চৌধুরী' ছদ্মনামে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ পত্রিকায় (যার বর্তমান নাম হলো নাওয়ায়ে গাযওয়ায়ে হিন্দ) প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে তিনি নুসরাতে দ্বীনের

আমানতদারগণ শিরোনামে আনসারুল জিহাদ নিয়ে এক হৃদয়স্পর্শী রচনা লেখেন। এর ভূমিকা লেখার ও প্রুফরিডিংয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল আমারই। তিনি বহু আরবী রচনারও উর্দু অনুবাদ করেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো সম্মানিত শায়খ আবু বাসীর নাসির আল-উহাইশির নাইন-ইলেভেন হামলার কাহিনি। আবার, মুজাহিদদের আমীর, হাকীমুল উম্মাহ মুহতারাম শায়খ আইমান আয-জাওয়াহিরীর অমূল্য গ্রন্থ ফুরসান তাহতা-রায়াতিন নবী ﷺ—এরও তিনি উর্দু অনুবাদ করেন, যদিও কিছু কারিগরি কারণে সেটি প্রকাশিত হতে পারেনি। তাছাড়া, রেহান ভাইয়ের কণ্ঠ আস্-সাহাব মিডিয়ার বিভিন্ন ভিডিও প্রকাশনায় শোনা যেত।

রেহান ভাই শুধু একজন মুজাহিদ যোদ্ধা ও নেতা ছিলেন না; বরং ছিলেন একজন সংবেদনশীল দাঈ, দক্ষ সংগঠক, বিশ্বস্ত বন্ধু, অনুগত সন্তান, স্নেহময় স্বামী ও দয়ালু পিতা। তার রেখে যাওয়া দুটি ছোট ছেলে আছে। আল্লাহ তাআলা যেন তাদের সৎ করে গড়ে তোলেন, তেমন করে গড়ে তোলেন, যেমন মুমিন সন্তানদের তিনি দেখতে ভালোবাসেন— যেমনটি রেহান ভাই নিজে তাদের জন্য কামনা করতেন। আজ রেহান ভাইয়ের দেহ আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের মুসা কালার এক কবরস্থানে শুয়ে আছে। আর তার আত্মা সবুজ পাখির অবয়বে রূপান্তরিত হয়ে আরশ তলের ঝুলন্ত প্রদীপে বসবাস করছে। যখন ইচ্ছে হয়, তখন তারা জান্নাতে বিচরণ করে এবং জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করে। (আমরা তাঁকে তেমনই গণ্য করি, আল্লাহ তাঁর হিসাব গ্রহণ করবেন এবং তিনি তাঁর জন্য যথেষ্ট। আল্লাহর কাউকে পবিত্র ঘোষণা করি না)

এটি এক বিরাট সৌভাগ্য, মহানবী ﷺ–এর উম্মতের এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। এটি সাহাবায়ে কিরামের উত্তরাধিকার। আরবের বুকে জন্ম নেয়া

সেই সাহাবীরা যেমন পারস্য ও শাম, মিশর ও মরক্কো, কাবুল ও মাকরান পর্যন্ত গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছিলেন, আজ তাদের আরবী–আযমি উত্তরসূরিরাও হেলমান্দ ও কাবুলে শাহাদাত লাভ করে সমাধিস্থ হচ্ছেন।

রেহান ভাই নিঃসন্দেহে অনেক বড় কিছুর হকদার। এই কয়েকটি পৃষ্ঠা তাঁর হক আদায়ে যথেষ্ট নয়। তবু, মাহফিলে উস্তাদ-এর এই পর্বকে আমি রেহান ভাইয়ের স্মৃতিচারণের সমাপ্তি টেনে এখানে শেষ করছি। শেষদিকে, রেহান ভাই রহিমাহুল্লাহর কিছু ছবি তাঁর পরিবার–পরিজনের জন্য বিশেষভাবে এবং সাধারণ পাঠকের জন্য উপস্থাপন করছি।

وما توفيقي إلا بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(চলবে, ইনশাআল্লাহ)

# তুফানুল আকসা

# আল্লাহর পথে এগিয়ে চলো — কিসের অপেক্ষা?

মুজাহিদ আবু উবাইদাহ হাফিযাহুল্লাহ-এর হৃদয়বিদারক বক্তৃতার পর

হাইয়াতু উলামা-ই-ফিলিস্তিনের বিবৃতি ও আহ্বান

**হাইয়াতু উলামায়ে ফিলিস্তিন**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ

“আর যদি তারা (মুসলমানেরা) তোমাদের কাছে দ্বীনের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের উপর ফরয।” [সূরা আল আনফাল ০৮:৭২]

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি এ উম্মাহকে নুসরতের দায়িত্বে মর্যাদাবান করেছেন, আর মজলুমদের পাশে দাঁড়ানোকে সম্মান, অঙ্গীকার ও দায়িত্বরূপে নির্ধারণ করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুজাহিদদের ইমাম, আমাদের নবী ﷺ-এর উপর, যিনি বলেছেন:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يُسْلِمُه

“মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখে না এবং তাকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে না।” (সহীহ আল-বুখারী)

ভূমিকা

যেমন সমগ্র মুসলিম বিশ্ব শুনেছে, আমরাও কাতায়িব কাসসামের মুখপাত্র মুজাহিদ আবু উবাইদাহ হাফিযাহুল্লাহ-এর সেই হৃদয় বিদারক ভাষণ শুনেছি—যা তিনি ক্ষতবিক্ষত গাজাকে কেন্দ্র করে প্রদান করেছেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে সেই সব শাসক, আলেম এবং অভিজাতদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা দিয়েছেন, যারা সংকটময় এই সময়ে নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের একাকী ফেলে রেখেছে।

হাইয়াতু উলামা-ই-ফিলিস্তিন সাক্ষ্য দিচ্ছে: এই আর্তনাদ কোনো তাৎক্ষণিক আবেগ নয়। এটি এসেছে দীর্ঘ ধৈর্যের পর, দরজায় দরজায় কড়া নাড়ার পর, আর ক্ষতবিক্ষত অন্তর থেকে নির্গত ব্যথাতুর আহাজারির পর—যার জবাব এসেছে মৃতের মতো নীরবতা দিয়ে, দর্শকের মতো নিষ্ক্রিয়তা দিয়ে। এদিকে প্রতিনিয়ত গাজার শিশুদের রক্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর-বাড়ি, ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ সারা বিশ্বের মুসলমানদের দ্বীন, তাদের সম্মান ও তাদের আনুগত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছে।

আহ্বান ও স্মরণঃ

আমরা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেই ভয়াবহ অবস্থানের কথা, যা কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত গুরুতর হবে—যখন সবাই তাঁর সামনে দাঁড়াবে। আজ আমরা একটি হৃদয়স্পর্শী বার্তা পাঠাচ্ছি তাদের প্রতি, যাদের অন্তরে এখনো জীবনের স্পন্দন, ঈমান ও সম্মানের কিছুটা অবশিষ্ট আছে:

এক. সমগ্র উম্মাহর আলেমদের উদ্দেশে

হে নবীদের উত্তরাধিকারীগণ! হে সত্য ও আনুগত্যের বাহকগণ!

এটাই আপনাদের শেষ সুযোগ। কিয়ামতের দিন যেন শহীদরা আপনাদের বিপক্ষে দাঁড়াতে না পারে। যদি আজ পিছিয়ে যান, কাল গাজা আপনাদের ক্ষমা করবে না। যদি আজ ক্ষতকে নিরাময়হীনভাবে ঝরতে দেন, কাল আল্লাহর সামনে আপনাদের পক্ষ থেকে কেউ সুপারিশ করবে না।

তাই উঠুন, জেগে উঠুন! নীরবতার কাফন ছিঁড়ে ফেলুন, ভয়ভীতির শিকল ভেঙে দিন।

দুই. তুরস্কের আলেমদের উদ্দেশে...

হে উম্মাহর সমস্যায় অগ্রগামী সাহসীরা! হে উসমানী ন্যায়বিচারের উত্তরাধিকারীগণ! এ মুহূর্ত আপনাদের জন্য, এ দায়িত্ব আপনাদের উপর। আমরা জোরালোভাবে আপনাদের আহ্বান জানাই—অবিলম্বে জরুরি বৈঠক আহ্বান করুন। গাজার মানুষের পাশে দাঁড়াতে কার্যকর ও বাস্তব পদক্ষেপ নিন, যাতে শুধু কথার জগৎ থেকে বের হয়ে বাস্তব ময়দানে অগ্রসর হওয়া যায়। রাষ্ট্রপতি এরদোয়ানের দুয়ারে এমনভাবে কড়া নাড়ুন, যেন বর্তমান পরিস্থিতির গুরুতর দশা ফুটে ওঠে। তাঁকে রাজি করান যে তুরস্ক সেই ভূমিকা পালন করুক, যা শহীদদের রক্ত আর সম্ভ্রমহারা নারীদের হাহাকারের মর্যাদা রক্ষা করে।

তিন. পাকিস্তানের আলেমদের উদ্দেশে— বিশেষ করে মুফতী তাকি উসমানী সাহেবের প্রতি...

হে দৃঢ় ঈমান ও সেজদাপ্রাণ ললাটের অধিকারীগণ! হে শহীদ ও মুজাহিদদের উত্তরাধিকারীরা!

আমরা আল্লাহর নামে আপনাদের অনুরোধ করছি—গাজার জন্য মাঠে নেমে পড়ুন। শহরে শহরে, মোড়ে মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি নিন, পথে পথে ক্যাম্প বসান। এমন কর্মসূচি দিন, যাতে আপনাদের সরকার বাধ্য হয় এই গণহত্যা থামানোর বাস্তব পদক্ষেপ নিতে এবং উম্মাহর মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে।

চার. মিসরের গর্বিত জনতার উদ্দেশে...

হে গাজার প্রতিবেশীরা! হে আলে-কিনানা, যাদের রগে নীলনদের উদারতা বইছে, আর যাদের অন্তর সালাহউদ্দীনের রক্তে ধ্বনিত হয়! তোমাদের উপর ফরয—তোমরা এই শাসন ব্যবস্থার মোকাবিলা করো, যারা রাফাহ সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে, সাহায্য আটকে দিয়ে গাজাকে অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তোমাদের ফরয—সেনাদের মতো দলে দলে রাফাহ সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাও। তার শেকল ভেঙে দাও, দ্বার খুলে দাও—যাতে খাদ্য, ওষুধ, আর সাহসী তরুণেরা এ সময় গাজায় পৌঁছে যেতে পারে। আজ যদি দেরি করো, কাল আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাদের জবাবদিহির মুখোমুখি করবেন। আজ যদি নারীদের, শিশুদের, বৃদ্ধদের, বিধবাদের, আহতদের একা ফেলে দাও, কাল আল্লাহর সামনে তোমাদের পক্ষ থেকে সুপারিশকারী কেউ থাকবে না। তাহলে নিজেদের বৈঠকগুলো জাগরণের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করো। মানুষকে এ মুহূর্তের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দাও। যাতে গাজা ও মুজাহিদদের ব্যাপারে নিজেদের উপর

আরোপিত উদাসীনতার দোষ তারা মুছে ফেলতে পারে। পুরো উম্মাহ তোমাদের অপেক্ষায়। তোমরা যেন মিসরকে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা ও মর্যাদার পথে ফিরিয়ে আনো, মজলুমদের সাহায্যে এগিয়ে আসো এবং জালেমদের শেকল ভাঙার দায়িত্ব পালন করো।

পাঁচ. সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশে...

হাইয়াতু উলামা-ই-ফিলিস্তিন আহ্বান জানাচ্ছে—গাজাকে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষায় বৈশ্বিক আন্দোলনে ব্যাপক অংশগ্রহণ করুন। আগামীকাল রবিবার এই প্রচারণা শুরু হবে, অবরুদ্ধ সেই মানুষদের সমর্থনে—যারা পরিকল্পিত ও সংগঠিত দুর্ভিক্ষের শিকার। আমরা আলেম, দাঈ, খতীব, সাহিত্যিক ও উম্মাহর মুক্তপ্রাণদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি—আপনারা এ আন্দোলনে যোগ দিন, এর তত্ত্বাবধান করুন। জনগণ, গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করুন। যাতে এই উদ্যোগ জালেমদের মুখে এক শক্তিশালী চপেটাঘাত হয় এবং দুনিয়া জানতে পারে— গাজা একা নয়, বরং সমগ্র উম্মাহ তার অবরোধ ও গণহত্যার বিরুদ্ধে পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

সমাপনী আহ্বান

হে উম্মাহর মুক্তপ্রাণেরা! হে স্বাধীনতাকামীগণ! মনে রেখো—নীরবতা হলো বিশ্বাসঘাতকতা। যে কথা কাজে রূপ নেয় না, সেটিও বিশ্বাসঘাতকতা। আর গাজাকে গণহত্যার মুখে একা ফেলে রাখা হলো সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা।

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর জন্য, তোমাদের দ্বীনের প্রতি আন্তরিক হয়ে যাও। আল্লাহর জন্য, এই বিপদের সময়ে উম্মাহর পাশে দাঁড়াও। আল্লাহর জন্য গাজা, গাজার মানুষ, তাদের শহীদ ও তাদের দুঃখ-দুর্দশার খেয়াল রাখো। আল্লাহ তাআলা বলেন:

ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم

“তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তবে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় রাখবেন।” (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:০৭)

**হাইয়াতু উলামা-ই-ফিলিস্তিন**

২৪ মহররম ১৪৪৭ হিজরী

১৯ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

# গাজাবাসীর জন্য জরুরি সহায়তার আহ্বান

**—শায়খ ইবরাহীম আল-বান্না হাফিযাহুল্লাহ**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সব প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ

“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় করবেন।” (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:০৭)

আর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল ﷺ এর উপর, যিনি বলেছেন:

ما من امرئٍ يخذُلُ مسلمًا في موطنٍ يُنتقَصُ فيه من عِرضِه ويُنتَهك فيه من حُرمتِه إلا خذَله اللهُ في موطنٍ يُحبُّ فيه نُصرتَه

“যে ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোনো মুসলমানকে পরিত্যাগ করে, যেখানে তার সম্মান লুণ্ঠিত হচ্ছে, তার মর্যাদা ভঙ্গ করা হচ্ছে—আল্লাহও তাকে সেই দিনে ত্যাগ করবেন, যেদিন সে সর্বাধিক সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করবে।”

## ভূমিকা

আজ গাজায় আমাদের ভাইদের উপর যে হত্যাযজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ এবং রোজ রোজ যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠছে, তা এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যে, পৃথিবী এখন শিশু, বৃদ্ধ, নারী এবং এমনকি দুধের শিশুর প্রতিদিন ডজন ডজন—কখনো শত শত—নিধনের খবর শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

এ অবস্থা স্পষ্ট সতর্কবার্তা: যদি সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ঘুম থেকে না জাগে, তবে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি সমগ্র উম্মতের উপর নেমে আসবে—তাদের ছাড়া, যাদের প্রতি আল্লাহ বিশেষ দয়া করেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاۤصَّةً ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“তোমরা সেই ফিতনার (পরীক্ষা ও শাস্তি) থেকে বাঁচো, যা শুধু জালেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তোমাদের সবাইকে গ্রাস করবে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ শাস্তি দিতে কঠোর।” (সূরা আনফাল ০৮:২৫)

## লজ্জাজনক নীরবতা

গাজায় যা ঘটছে তার প্রতি নীরব থাকা আসলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কপালে কলঙ্কের দাগ টেনে দেয়। ইতিহাস এ কথা ভুলে যাবে না, বরং পরবর্তী প্রজন্ম এই নীরবতা মনে রাখবে। তারা কামনা করবে—কেন তারা আমাদের যুগে ছিল না, যাতে এই লজ্জাজনক নীরবতার প্রায়শ্চিত্ত করতে

পারত, সম্মান ও মর্যাদার পতাকা উঁচিয়ে শক্তি একত্রিত করে গাজার মজলুম ভাইদের সাহায্যের দায়িত্ব পালন করতে পারত।

## মিশরবাসীর প্রতি আহ্বান

আজ আমরা বিশেষভাবে মিশরের ভাইদের, আর বিশেষ করে মর্যাদা ও বীরত্বে গর্বিত সিনাইয়ের গোত্রগুলোকে আহ্বান জানাই: হে মিশরবাসী! এগিয়ে আসুন আপনাদের সেই ভাইদের দিকে, যারা গাজায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করছে—আপনাদের সামনে জোর করে দাঁড় করানো দেয়াল ও কৃত্রিম সীমানার ওপারে। আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, কীভাবে আপনারা নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করছেন, যখন আপনাদেরই ভাইয়েরা সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে? কীভাবে আপনাদের কেউ নিশ্চিন্তে এক টুকরো রুটি মুখে তুলবে, যখন ঠিক পাশেই গাজার শিশু ও বৃদ্ধরা ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে? কীভাবে সম্ভব, আপনাদের প্রতিবেশীরা তৃষ্ণায় প্রাণ হারাবে অথচ আপনাদের মধ্য দিয়েই বয়ে চলেছে নীলনদ? তবে কি আপনাদের ভেতর থেকে লজ্জাশীল, মর্যাদাবান মানুষরা সব মরে গেছে? কবি বলেন: "আমি প্রবেশ করলাম বীরত্বের ঘরে, দেখি সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: হে পবিত্রা, কেন কাঁদছো? সে বলল: আমি কীভাবে না কাঁদি, যখন আমার আপনজনেরা সকল মানুষের আগে মরে গেছে!" »

হে মিশরবাসী! এই ভুয়া ও কৃত্রিম সীমানা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলুন—আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া করুন এই কামনা করি। দৌড়ে পৌঁছে যান মজলুম ভাইদের কাছে, খাদ্য, পানি ও ওষুধ তাদেরকে সরবরাহ করুন। মনে রাখবেন আপনাদের দায়িত্ব অন্য সবার চেয়ে বেশি। সাবধান! আপনাদেরই

ভাষায় কথা বলা, আপনাদেরই পোশাক পরা, আপনাদেরই দেশে থাকা কোনো "অভ্যন্তরীণ শত্রু" যেন আপনাদেরকে সাহায্যের পথে বাধা দিতে না পারে। মনে রাখবেন, প্রকৃত মানদণ্ড জাতি বা ভাষা নয়—বরং সৎকর্ম। রাসূল ﷺ বলেছেন:

ما آمن بي مَن بات شبعانًا وجاره جائعٌ إلى جنبه وهو يعلم به

"সে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনেনি, যে নিজে পেট ভরে রাত কাটায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে—এবং সে তা জানে।"

## সীমান্ত পার হওয়ার অপরিহার্যতা

আজ ইউরোপ থেকে আসা কিছু মানুষ "Soumoud Convoy"-এ অংশ নিচ্ছে—তারা মুসলিম নয়, তবু কি তারা গাজার নারী-শিশুদের জন্য apna Dil চেয়ে বেশি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল? যদি আপনারা বাধা ভাঙতে না পারেন, সীমান্ত অতিক্রম না করেন, আর আপনাদের ভাইদেরকে ইহুদীদের নির্যাতন ও ক্ষুধা থেকে রক্ষা না করেন, তবে আপনাদের ভেতর কোনো কল্যাণ অবশিষ্ট থাকবে না!

## প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি বার্তা

আমরা গাজার প্রতিবেশী জর্ডান, শাম ও লেবাননের ভাইদেরও আহ্বান জানাই—আপনারা এগিয়ে আসুন । কারণ গাজার মজলুমদের সাহায্য করা আপনাদের এবং মিশরবাসীর উপর অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি আবশ্যক। আপনাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে—এমনকি যদি জীবন

বিসর্জন দিতেও হয়। যদি ক্ষুধায় কঙ্কালসার দেহ, প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত হয়ে অচেতন হয়ে পড়া মুসলিম শিশু ও বৃদ্ধরাও আপনাদের বিবেক না জাগায়, তবে আর কবে জাগবে?

## ধনীদের প্রতি সতর্ক বার্তা

শেষে আমরা ধনী-সচ্ছলদের স্মরণ করিয়ে দিই—কিয়ামতের ভয়ঙ্কর সেই সতর্কবাণী আপনাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছে। সেদিনের কথা সত্যিকার অর্থে কল্পনা করলেই মানুষ কামনা করবে, সে যদি নিঃস্ব থাকত! আপনাদের ধনসম্পদে আল্লাহর হক রয়েছে। আপনাদের কপালে দাগ লেগে যাওয়ার আগেই দ্রুত ব্যয় করুন! এ সম্পদ হয় আপনাদের মুক্তির উপায় হবে, জান্নাতের সোপান হবে, আর তা-ই হবে সৌভাগ্যের ব্যবসা। নয়তো এই সম্পদই হবে জাহান্নামের আগুনে আল্লাহর ক্রোধের কারণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ
يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۗهٰذَا مَا كَنَزْتُمْ
لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

“যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না, তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ। সেদিন এ ধনসম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, আর তাদের কপাল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ কেটে বলা হবে: ‘এটাই সেই ধন যা তোমরা জমা রেখেছিলে

নিজেদের জন্য। এখন ভোগ করো তোমাদের সেই সঞ্চয়'।" (সূরা তাওবা ০৯:৩৪–৩৫)

হে আল্লাহ! আমাদের গাজার দুর্বল ও মজলুম ভাইদের সাহায্য করো।

হে আল্লাহ! তাদের উপর থেকে এ নিকষ কালো বিপদ দূর করে দাও।

হে আল্লাহ! তোমার অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করো।

হে আল্লাহ! তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রেহাই দাও। ভীতি ও আতঙ্ক থেকে নিরাপত্তা দাও।

হে মর্যাদা ও শক্তির অধিপতি, হে দয়া ও করুণার রব!

ওয়াখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

# ফিলিস্তিনি সাংবাদিক আনাস আশ-শরীফের শেষ অসিয়ত

*আনাস আশ-শরীফ ছিলেন এক ফিলিস্তিনি সাংবাদিক এবং গাজায় আল-জাজিরার প্রতিনিধি। তিনি ১৯৯৬ সালে গাজার জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে জন্মগ্রহণ করেন। আল-আকসা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রাথমিকভাবে উত্তর গাজাভিত্তিক 'আশ-শামাল মিডিয়া নেটওয়ার্কে' স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ শুরু করার পর তিনি আল-জাজিরায় যোগ দেন। সেখানে তিনি উত্তর গাজার প্রতিনিধি, ভিডিওগ্রাফার ও প্রতিবেদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।*

*অক্টোবর ২০২৩ থেকে গাজার যুদ্ধে তিনি পূর্ব গাজায় অবস্থান করে চরম ঝুঁকি সত্ত্বেও নির্ভীকভাবে সংবাদ প্রচার চালিয়ে যান। তাঁর সাহসী ও অকপট সাংবাদিকতা তাঁকে দ্রুত গাজার এক পরিচিত ও উল্লেখযোগ্য মুখে পরিণত করে। মাত্র ২৮ বছর বয়সে তিনি উত্তর গাজার পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন এবং ইসরাঈলি বোমাবর্ষণ, যুদ্ধাপরাধ ও সেগুলো থেকে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের ব্যাপক কভারেজ করেন। এর ফলে তাঁকে একাধিকবার ইসরাঈলের তরফে টার্গেট করার হুমকি দেওয়া হয়, এমনকি ইসরাঈলি সেনারা তাঁর চরিত্র হননের চেষ্টা পর্যন্ত চালায়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এক বিমান হামলায় তাঁর পিতা শহীদ হন।*

*২০২৫ সালের ১০ ও ১১ আগস্টের মধ্যরাতে ইসরাঈলি বিমান বাহিনী গাজার আল-শিফা হাসপাতালের বাইরে অবস্থানরত সাংবাদিকদের তাঁবুকে লক্ষ করে বোমা হামলা চালায়। এতে আনাস আশ-শরীফ আরও চারজন সহকর্মী সাংবাদিকের সঙ্গে শাহাদাতবরণ করেন। ইসরাঈল কোনো রাখ ঢাক না করেই এই হত্যাযজ্ঞের দায় স্বীকার করে এবং মিথ্যা দাবি তোলে যে, আনাস নাকি হামাসের একটি ইউনিট পরিচালনা করছিলেন যা রকেট হামলায় জড়িত ছিল।*

*শাহাদাতের কয়েক মুহূর্ত আগে পর্যন্তও তিনি গাজা শহরে ইসরাঈলের তীব্র বোমাবর্ষণের দৃশ্য বিশ্বকে দেখাচ্ছিলেন।*

*আল্লাহ তাআলা আনাস আশ-শরীফকে ক্ষমা করুন, তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁকে শহীদ ও সৎকর্মশীলদের দলে শামিল করুন—আমীন।*

*নিচে আনাস আশ-শরীফের অসিয়তের বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো। তিনি এটি ২০২৫ সালের এপ্রিলে লিখেছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর প্রতিষ্ঠান সেটি তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে প্রকাশ করে। -সম্পাদক*

এটি আমার অসিয়ত এবং আমার শেষ বার্তা। যদি এই কথাগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছায়, তবে জেনে নিন—ইসরাঈল আমাকে হত্যা করতে এবং আমার কণ্ঠস্বর চিরতরে স্তব্ধ করতে সফল হয়েছে।

সবার আগে বলবো: আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আল্লাহ জানেন, জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরের রাস্তাঘাট ও গলিতে চোখ খোলার পর থেকেই আমি আমার জাতির ভরসা ও কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, আল্লাহ যদি আমার আয়ু বাড়িয়ে দেন, তবে আমি পরিবার-পরিজনকে নিয়ে আমার আসল শহর, অধিকৃত আসকালান (আল-মাজদাল)-এ ফিরে যেতে পারব। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা আগে চলে এসেছে, আর তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। আমি যন্ত্রণার সব রূপ অনুভব করেছি, বহুবার শোক ও বেদনার স্বাদ পেয়েছি। তবুও এক মুহূর্তের জন্যও সত্যকে বিকৃত না করে, যেমন আছে ঠিক তেমনভাবেই পৌঁছে দিতে দ্বিধা করিনি। যেন আল্লাহ সাক্ষী হয়ে যান—তাদের বিরুদ্ধে, যারা নীরব থেকেছে, যারা আমাদের হত্যাকে মেনে নিয়েছে, যারা আমাদের নিঃশ্বাস রোধ করেছে, যাদের হৃদয় গলেনি আমাদের নারী ও শিশুদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহাবশেষ দেখেও, যারা এই গণহত্যা থামানোর জন্য কিছুই করেনি—যা দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের জাতিকে সহ্য করতে হয়েছে। আমি ফিলিস্তিনকে আপনাদের হাতে সঁপে দিচ্ছি। এটি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মুকুট, আর বিশ্বের প্রতিটি স্বাধীনচেতা মানুষের হৃদস্পন্দন। আমি এর জনগণকে আপনাদের হাতে সঁপে দিচ্ছি—তার নিপীড়িত ও নিরপরাধ শিশুদের, যাদের স্বপ্ন দেখার বা শান্তিতে বাঁচার সুযোগই মেলেনি। তাদের নির্মল দেহ হাজার হাজার টন ইসরাঈলি বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রের নিচে চূর্ণ হয়েছে, টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, দেয়ালে ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি আপনাদের ওসিয়ত করছি— কোনো শৃঙ্খল আপনাদের কণ্ঠ যেন স্তব্ধ করতে না পারে, কোনো সীমান্ত যেন আপনাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে না পারে। আপনারা এই ভূমি ও এর অধিবাসীদের মুক্তির জন্য

সেতু হয়ে উঠুন—যতক্ষণ না মর্যাদা ও স্বাধীনতার সূর্য আমাদের ছিনিয়ে নেওয়া মাতৃভূমির ওপর উদিত হয়।

আমি আমার পরিবারকে আপনাদের হাতে অর্পণ করছি—আপনারা তাদের খেয়াল রাখবেন। আমি আমার প্রিয় কন্যা শাম-কে আপনাদের হাতে অর্পণ করছি—যিনি আমার চোখের শীতলতা, যাকে আমি আমার স্বপ্ন মতো বড় হতে দেখতে পারিনি। আমি আমার প্রিয় পুত্র সালাহ-কেও আপনাদের হাতে অর্পণ করছি—যাকে আমি জীবনে সহায়তা দিতে চেয়েছিলাম, তার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, যতক্ষণ না সে এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে আমার বোঝা কাঁধে তুলে নিয়ে আমার মিশন এগিয়ে নিতে পারে। আমি আমার প্রিয় মা-কে আপনাদের হাতে অর্পণ করছি—যাঁর বরকতময় দোয়া আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছে, যাঁর দোয়াই ছিল আমার দুর্গ, আর যাঁর আলো ছিল আমার পথের দিশারি। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁকে ধৈর্য দান করেন এবং আমার পক্ষ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। আমি আমার জীবন সঙ্গিনী, প্রিয়তমা স্ত্রী উম্মে সালাহ (বিয়ান)-কে আপনাদের হাতে অর্পণ করছি। যুদ্ধ আমাকে তাঁর কাছ থেকে বহু দিন বহু মাস বিচ্ছিন্ন রেখেছে, কিন্তু তিনি আমাদের এই সম্পর্কে অটল থেকেছেন—জলপাই গাছের সেই কাণ্ডের মতো যা কখনো নত হয় না। তিনি ধৈর্যশীল, আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, আর আমার অনুপস্থিতিতে দৃঢ় ঈমান ও সাহসে সমস্ত দায়িত্ব বহন করে গেছেন।

আমি আপনাদের অসিয়ত করছি—আপনারা তাঁদের পাশে দাঁড়াবেন, আল্লাহর পরে তাঁদের ভরসা হবেন। যদি আমি মারা যাই, তবে আমি আমার নীতিতে অটল থেকেই মরব। আমি আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি,

আমি তাঁর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট, তাঁর সাক্ষাৎ লাভে দৃঢ়বিশ্বাসী এবং নিশ্চিত যে আল্লাহর কাছে যা আছে, তাই উত্তম এবং চিরস্থায়ী।

হে আল্লাহ! আমাকে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ ক্ষমা করুন, আর আমার রক্তকে আমার জাতি ও পরিবার-পরিজনের জন্য মুক্তির পথে আলো বানিয়ে দিন।

যদি আমার কাছ থেকে কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন, কারণ আমি আমার অঙ্গীকার পূরণ করেছি, কখনো বদলাইনি, আর কখনো বিশ্বাসঘাতকতাও করিনি।

গাজাকে কখনো ভুলে যাবেন না... আর আমার জন্য দোয়া করবেন—যেন আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন এবং আমাকে কবুল করে নেন!

— আনাস জামাল আশ-শরীফ

০৬ এপ্রিল ২০২৫

# প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনি – মরক্কো

নোমান হিজাযি

## মরক্কো (আল-মাগরিব)

আল-মামলাকা আল-মাগরিবিয়া—যাকে আরবীতে সংক্ষেপে আল-মাগরিব আর উর্দুতে মারাকেশ (মরক্কো) নামে ডাকা হয়—ছিল জর্ডানের পর দ্বিতীয় আরব দেশ, যে দেশ ইসরাঈলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে মুসলিম ইতিহাসে আরেকটি কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করে। যদিও ফিলিস্তিন প্রশ্নে মরক্কোর বিশ্বাসঘাতকতা ছিল গুরুতর প্রকৃতির, তবুও উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এক দূরবর্তী দেশ হওয়ায় তাদের এই নিন্দনীয় কর্মকাণ্ড গণমাধ্যমে তেমনভাবে আলোচনায় আসেনি, যতটা আসা উচিত ছিল।

## প্রেক্ষাপট

ভৌগোলিকভাবে ইসরাঈল ও মরক্কোর মধ্যে দীর্ঘ দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও মরক্কো কেন এত তাড়াতাড়ি ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করল, তার পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল:

মরক্কোতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইহুদীরা বসবাস করে আসছে। এদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশকে তোশাভিম (Toshavim) ইহুদী বলা হয়, যারা দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে সেখানে বসবাস করছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদীদের পূর্বপুরুষ ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে আন্দালুস পতনের পর স্পেনীয় খ্রিস্টান রাজত্ব থেকে বহিষ্কৃত হয়ে মরক্কোতে এসে বসতি স্থাপন করে। এদেরকে বলা হয় সেফারদি ইহুদী (Sephardic Jews)[21]

১৯৫০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অবৈধ ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কিছু পর মরক্কোতে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে তিন লাখ—যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ।[22]

এত বড় একটি ইহুদী উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই জায়নবাদী আন্দোলনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অচিরেই মরক্কো হয়ে ওঠে তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

১৯১২ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মরক্কো ছিল ফরাসি উপনিবেশ। এই চুয়াল্লিশ বছরের দাসত্ব দেশটিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৫৬ সালে স্বাধীনতা লাভের পর মরক্কো অন্যান্য উপনিবেশ মুক্ত মুসলিম দেশের মতো রাজনৈতিক ও মানসিকভাবে পশ্চিমাদের দাসত্বে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পরপরই মরক্কোর রাজনৈতিক অভিজাতরা ফ্রান্স ও অন্যান্য পশ্চিমা রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের নীতি গ্রহণ করে। যেহেতু ইসরাঈল ছিল পশ্চিমাদের প্রিয়—যদিও অবৈধ—সন্তান, তাই মরক্কোর

[21] Jewish Morocco: A History from Pre-Islamic to Post-Colonial Times by Emily Gottereich (2020)।

[22] Morocco film searches out Jews who left for Israel – Al Arabiya (27 February 2013)

শাসকরাও পশ্চিমাদের নির্দেশে ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে থাকে।

## সুলতান মুহাম্মাদ পঞ্চম (১৯২৭–১৯৬১)

মরক্কোতে ইহুদীদের সঙ্গে এবং পরবর্তীতে ইসরাঈলের সঙ্গে সহযোগিতার সূচনা হয়েছিল সুলতান মোহাম্মদ পঞ্চমের আমল থেকেই। তিনি ১৯২৭ সালে মরক্কোর সুলতান হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি মিত্রশক্তির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তবে ১৯৪০ সালে মরক্কো নাজি-অনুপ্রাণিত 'ভিশি' (Vichi) ফরাসি সরকারের অধীনে চলে যায়।[23] এই সময় সুলতান মোহাম্মদ পঞ্চম ভিশি সরকারের ইহুদী বিরোধী নীতির বিরোধিতা করেন এবং সেগুলো মরক্কোয় পুরোপুরি কার্যকর হতে দেননি।[24] এর ফলে মরক্কোর ইহুদী সম্প্রদায় এবং আন্তর্জাতিক ইহুদী সংগঠনগুলোর কাছে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ সালে ভিশি সরকার পরাজিত হয় এবং মরক্কো মিত্রবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে, যা পরবর্তীতে মিত্রপন্থী ফরাসি সরকারের হাতে হস্তান্তরিত হয়।

২২ জানুয়ারি ১৯৪৩ সালে কাসাব্লাঙ্কায় অনুষ্ঠিত আনফা সম্মেলনের সময় সুলতান মোহাম্মদ পঞ্চম ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে। এ

[23] ভিশি সরকার বলতে ১৯৪০ সালে নাজি জার্মানির হাতে ফ্রান্স পরাজিত হওয়ার পর অবশিষ্ট ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত ফরাসি সরকারকে বোঝায়, যার রাজধানী ছিল 'ভিশি'। এই সরকার নাজি জার্মানির সঙ্গে চুক্তি করেছিল এবং পরবর্তী দুই বছর, মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত হওয়া পর্যন্ত, কার্যত নাজি নীতিমালার অনুকরণেই শাসন পরিচালনা করেছিল

[24] Susan Gilson Miller, A History of Modern Morocco (2013)

বৈঠকে রুজভেল্ট তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে মরক্কো দশ বছরের মধ্যে স্বাধীন হবে।[25]

১৯৪৮ সালে ইসরাঈলি অবৈধ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর সারা বিশ্ব থেকে ইহুদীদের সেখানে বসতি স্থাপন করাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছিল একাধিক সংস্থা—ইহুদী এজেন্সি (Jewish Agency), মুসাদ লে-আলিয়া বেত (Mossad LeAliyah Bet), এবং তাদের তত্ত্বাবধানে মরক্কো থেকে ইহুদীদের ইসরাঈলে হিজরত সংগঠিত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন 'কাডিমা' (Cadima)। এ সংস্থাগুলো মরক্কোয় আংশিকভাবে গোপনে এবং আংশিকভাবে প্রকাশ্যে কার্যক্রম চালাচ্ছিল।[26] — গোপনে এজন্য যে ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার পর আরব লীগ ইসরাঈল বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিল এবং মরক্কোও আনুষ্ঠানিকভাবে তাতে অংশ নেয়। ফলে সরকারি অনুমতিতে ইহুদীদের ইসরাঈলমুখী হিজরত সম্ভব ছিল না। আবার প্রকাশ্যে এজন্য যে এই সংস্থাগুলোর কর্মকাণ্ড এতটাই উন্মুক্ত ছিল যে সুলতানের অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব। তিনি চাইলে তা বন্ধ করতে পারতেন, কিন্তু উপেক্ষা করে কার্যত তাদের কাজ চালানোর অবাধ সুযোগ দেন।[27]

---

[25] Susan Gilson Miller, A History of Modern Morocco (2013)

[26] Immigrants, by period of Immigration, Country of Birth and Last Country of Residence. CBS, Statistical Abstract of Israel, Government of Israel, 2009

[27] এখানে কেউ মনে করতে পারেন, সুলতান মুহাম্মাদ পঞ্চম মরক্কো থেকে ইহুদীদের হিজরত ঠেকাননি এই কারণে যে তিনি দেশকে ইহুদী উপস্থিতি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে এর কোনো ভিত্তি নেই। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে মরক্কো ইহুদী মুক্ত হয়নি, বরং অবৈধ ইসরাঈলি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করেছে। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে একজন ইহুদীরও ইসরাঈলে গমন মানে নতুন কিছু ফিলিস্তিনি

ফলস্বরূপ, পরবর্তী বছরগুলোতে মরক্কোর প্রায় চল্লিশ শতাংশ ইহুদী জনগোষ্ঠী ইসরাঈলে হিজরত করে।

## শাহ হাসান দ্বিতীয় (১৯৬১ – ১৯৯৯)

সুলতান মোহাম্মদ পঞ্চমের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহ হাসান দ্বিতীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মরক্কোর ইহুদীদের ইসরাঈলে হিজরতের প্রশ্নে যেখানে মোহাম্মদ পঞ্চমের ভূমিকা ছিল মূলত উদাসীন পর্যায়ের, সেখানে শাহ হাসান দ্বিতীয় এই নীতিকে বহুদূর এগিয়ে নেন। এ কারণে ইতিহাসে মরক্কো-ইসরাঈল সম্পর্কের সূচনা সাধারণত মোহাম্মদ পঞ্চম নয়, বরং শাহ হাসান দ্বিতীয়ের শাসনামল থেকেই বিবেচিত হয়।

## অপারেশন ইয়াখিন

ইসরাঈলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ মরক্কোর সরকারের সহযোগিতায় শাহ হাসান দ্বিতীয়ের নেতৃত্বে যে অভিযান শুরু করেছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল মরক্কোর ইহুদীদের গোপনে ইসরাঈলে হিজরত করানো। মরক্কো সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও অভিযানটি গোপনে রাখা হয়েছিল দুটি কারণে: প্রথমত, আরব লীগের পক্ষ থেকে মরক্কোর ইহুদীদের ইসরাঈলে প্রেরণে আনুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা ছিল; দ্বিতীয়ত, মরক্কোর

ভূমি দখল হওয়া, ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত হওয়া এবং জায়নিস্ট রাষ্ট্রের ভিত মজবুত হওয়া। সুতরাং সুলতান মুহাম্মাদ পঞ্চমের নীতি এই প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে দেয়

জনমতও এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ছিল। যদি এ কাজ প্রকাশ্যে করা হতো, তবে মরক্কো সরকারকে জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হতো।

এই অভিযান ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে শুরু হয় এবং ১৯৬৪ সালের বসন্ত পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর পূর্বে ইসরাঈলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ, মরক্কো সরকার এবং একটি মার্কিন সংগঠন Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS)-এর মধ্যে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ন এবং মরক্কোর শাহ হাসান দ্বিতীয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত ছিল।

চুক্তি অনুযায়ী, শাহ হাসান দ্বিতীয়কে প্রথমে ৫ লক্ষ মার্কিন ডলার অগ্রিম প্রদান করা হয়। এর সঙ্গে প্রথম ৫০,০০০ ইহুদীর হিজরতের জন্য প্রতি ব্যক্তির বিপরীতে ১০০ ডলার (মোট ৫০ লক্ষ ডলার) এবং এরপরের প্রায় ৪৭,০০০ ইহুদীর জন্য প্রতি ব্যক্তির বিপরীতে ২৫০ ডলার (মোট ১১ কোটি ৭৫ লক্ষ ডলার) পরিশোধের শর্ত ছিল।[28] এই অর্থপ্রদান করেছিল মার্কিন সংগঠন HIAS, যারা পুরো হিজরত প্রক্রিয়ার ব্যয়ভার বহন করেছিল]।

এই সময়কালে প্রায় ৯৭,০০০ ইহুদী মরক্কো থেকে ইসরাঈলে হিজরত করে।[29]

---

[28] ১৯৬১ সালে এক গ্রাম সোনার দাম ছিল ১.১২৫ মার্কিন ডলার, আর বর্তমানে (২০২৩–২৪ হিসাব) এক গ্রাম সোনার দাম ১০৮ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ আজকের মূল্যে হিসাব করলে, শাহ হাসান দ্বিতীয় পেয়েছিলেন প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার অগ্রিম; প্রথম ৫০,০০০ ইহুদীর জন্য প্রতি ব্যক্তির বদলে প্রায় ৯,৬০০ ডলার (মোট প্রায় ৪৮ কোটি ডলার); এবং পরবর্তী ৪৭,০০০ ইহুদীর জন্য প্রতি ব্যক্তির বদলে প্রায় ২৪,০০০ ডলার (মোট প্রায় ১ বিলিয়ন ১২ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার)।

[29] Martin Gilbert, In Ishmael's House: A History of Jews in Muslim Lands

## অস্ত্র ক্রয়, সামরিক প্রশিক্ষণ ও গোয়েন্দা সহযোগিতা

শাহ হাসান দ্বিতীয় মিশরের রাষ্ট্রপতি জামাল আব্দুন নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে আতঙ্কিত ছিলেন। তদুপরি মরক্কোর সঙ্গে আলজেরিয়ার সম্পর্কও ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। অন্যদিকে, ইসরাঈল তার Periphery Doctrine বা প্রান্তবর্তী কূটনীতির অধীনে এমন সব রাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে চাইছিল, যাদের সঙ্গে নাসেরের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না। এই অভিন্ন স্বার্থ মরক্কো-ইসরাঈল সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করে।

ক্ষমতায় আসার পরপরই মরক্কো, ইরানের শাহের সহযোগিতায়, গোপনে ইসরাঈল থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে। এর মধ্যে ছিল হালকা অস্ত্রশস্ত্র ও গুপ্তচরবৃত্তির সরঞ্জাম।

এছাড়া ইসরাঈল এই সময়ে মরক্কোর সেনাবাহিনীকে সামরিক প্রশিক্ষণও প্রদান করে। এ উদ্দেশ্যে মোসাদ এবং আইডিএফ (Israel Defense Forces)-এর উপদেষ্টাদের প্রেরণ করা হয়, যারা মরক্কোর সেনাদের বিদ্রোহ দমন, ট্যাকটিক্যাল অপারেশন এবং গোয়েন্দা তথ্যনির্ভর অভিযানের কৌশল শেখায়।[30]

এই সময় মরক্কো ও ইসরাঈলের মধ্যে আলজেরিয়া ও মিশরের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানও শুরু হয়। শাহ হাসান দ্বিতীয় মোসাদকে মরক্কোয় গোপন ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতিও দেন। গোয়েন্দা সহযোগিতার

[30] Ronen Bergman, "Israel-Morocco Deal Follows History of Cooperation on Arms and Spying," The New York Times

মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা ছিল শাহ হাসান দ্বিতীয়ের পক্ষ থেকে ইসরাঈলকে আরব লীগের সম্মেলনের গোপন রেকর্ডিং সরবরাহ করা।

## আরব লীগের গোপন সম্মেলন ও শাহ হাসান সানীর বিশ্বাসঘাতকতা

১৯৬৫ সালে মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কা শহরে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আরব লীগের একটি গোপন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নির্ধারণ করা— আরব দেশগুলো কি ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুত কিনা এবং এ লক্ষ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ আরব সামরিক কমান্ড গঠন করার প্রয়োজন আছে কিনা। শাহ হাসান দ্বিতীয় ইসরাঈলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ এবং শিন বেতকে এই সম্মেলনে গোয়েন্দাগিরির অনুমতি দেন। তাঁর অনুমতিতেই মোসাদ ও শিন বেতের একটি যৌথ ইউনিট 'দ্য বার্ড' (The Bird) কাসাব্লাঙ্কার সেই হোটেলের একটি পুরো তলা দখল করে নেয়, যেখানে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ওই ইউনিট সেখানে গুপ্তচর সরঞ্জাম বসায়, যাতে আরব নেতাদের এবং তাদের গোয়েন্দা প্রধানদের আলোচনাগুলো গোপনে রেকর্ড করা যায়। কিন্তু সম্মেলনের একদিন আগে, গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় শাহ হাসান ইউনিটটিকে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। পরবর্তীতে সম্মেলন শেষে তিনি নিজেই সব রেকর্ডিং ইসরাঈলের হাতে তুলে দেন।[31]

[31] Morocco tipped off Israeli intelligence, 'helped Israel win Six Day War', by Sue Surkes – The Times of Israel

এই রেকর্ডিং থেকে পাওয়া তথ্যের ফলেই ১৯৬৭ সালের দ্বিতীয় আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের শুরুতে আরব দেশগুলো আক্রমণ করার সুযোগ পাওয়ার আগেই ইসরাঈল প্রথম হামলা চালায়। সে সময় ইসরাঈল মিশর ও জর্দানের সম্পূর্ণ এবং সিরিয়ার অর্ধেক বিমান শক্তি ধ্বংস করে দেয়। এর মাধ্যমেই ইসরাঈলের নিশ্চিত বিজয় ঘটে। যুদ্ধের ফলে মিশর হারায় সিনাই উপদ্বীপ ও গাজা, জর্দান হারায় পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম এবং সিরিয়া হারায় গোলান মালভূমি।

এই সহযোগিতার বিনিময়ে শাহ হাসান সানী মোসাদের কাছে মরক্কোর বিরোধী দলীয় নেতা মাহদি বিন বারাক্কার হত্যায় সাহায্য চেয়েছিলেন। সম্মেলনের কয়েক সপ্তাহ পর, ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে, মোসাদ প্যারিস থেকে মাহদি বিন বারাক্কাকে অপহরণ করে নিখোঁজ করে ফেলে। এরপর তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। কিছু সূত্র অনুযায়ী, তাকে হত্যা করে তার দেহ এসিডে গলিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল।[32]

## ১৯৭৩ সালের আরব–ইসরাঈল যুদ্ধ (ইয়ম কিপুর যুদ্ধ) এ মরক্কোর অংশগ্রহণ

১৯৭৩ সালে মিশর ও সিরিয়া যখন ইসরাঈলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তখন মরক্কোর জন্য বড় দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। একদিকে আরব লীগে তার ভাবমূর্তি— যে সে ফিলিস্তিনি আন্দোলনের সমর্থক এবং ইসরাঈল বিরোধী। অন্যদিকে ইসরাঈলের সঙ্গে তার গোপন সম্পর্ক। এই দুই

[32] History: 1965, when the Mossad helped Morocco murder Ben Barka by Mohammed Jaabouk – YaBiladi

অবস্থানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা তার জন্য জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, আরব লীগের কাছে নিজের অবস্থান এবং মরক্কোর জনগণের কাছে নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য শাহ হাসান দ্বিতীয় প্রায় দুই থেকে তিন হাজার সেনা নিয়ে একটি বাহিনী সিরিয়ার সহায়তায় গোলান মালভূমির দিকে পাঠান। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে মরক্কোর সেনারা কোনো বড় আক্রমণাত্মক অভিযানে অংশ নেয়নি; তাদের ভূমিকা ছিল মূলত প্রতিরক্ষামূলক। এভাবে মরক্কো একদিকে আরব সেনাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করল, অন্যদিকে আরব লীগ ও জনগণকে সন্তুষ্ট করল, আবার ইসরাঈলের সঙ্গে তার গোপন সম্পর্কও অক্ষুণ্ণ রাখল। ইসরাঈলও জানত যে মরক্কোর সেনা অংশগ্রহণ যুদ্ধের ফলাফলে কোনো বড় পরিবর্তন আনবে না। এমনকি কিছু সূত্রে বলা হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে আগে থেকেই এই সমঝোতা ছিল যে মরক্কোর এই পদক্ষেপ কেবল আরব বিশ্বে তার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়।

## কুদস কমিটির প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে জেদ্দায় ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (OIC) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ষষ্ঠ সম্মেলনে কুদস কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিকে একটি স্থায়ী কমিটির মর্যাদা দেওয়া হয়, যার কাজ ছিল ইসরাঈল-ফিলিস্তিন সংঘাতের ফলে জেরুজালেমে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও মানবাধিকার সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ। কমিটির লক্ষ ছিল—

- জেরুজালেমে পবিত্র স্থানসমূহ, বিশেষত আল-আকসা মসজিদের পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখা।
- জেরুজালেমের সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত পরিচয় রক্ষার প্রচেষ্টাকে সংগঠিত করা।
- আরব-ইসরাঈল সংঘাত সম্পর্কিত গৃহীত প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে অবস্থান নেওয়া।
- যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকাগুলোর পুনর্গঠন, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে মানবিক ও সামাজিক উদ্যোগকে সমর্থন করা।

এই কুদস কমিটির সভাপতিত্ব মরক্কোর হাতে অর্পণ করা হয়, রাজা দ্বিতীয় হাসান এর নেতৃত্বে। এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৭৯ সালে মরক্কোতে অনুষ্ঠিত ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের দশম সম্মেলনে।

কী ভয়াবহ ট্র্যাজেডি ও দ্বিচারিতা! যে রাজা ১৯৬৫ সালে আরব লীগের বৈঠকের গোপন তথ্য ইসরাঈলের কাছে পাচার করে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাঈলকে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছিল, যার ফলে জেরুজালেমসহ বহু ফিলিস্তিনি ভূমি দখল হয়, হাজার হাজার মুসলমান শহীদ হন এবং লাখো ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হন—সেই রাজাই পরবর্তীতে আল-আকসার অভিভাবক ও ফিলিস্তিনিদের অধিকারের রক্ষক হিসেবে পরিচিত হলো।

## মিশর-ইসরাঈল সম্পর্ক স্থাপনে মরক্কোর ভূমিকা

১৯৭৬ সালের অক্টোবরে ইসরাঈলি প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিন গোপনে মরক্কো সফর করেন। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য তিনি মাথায় উইগ, বড়

নকল গোঁফ এবং কৃত্রিম চশমা পরে আসেন। মরক্কোতে তিনি রাজা দ্বিতীয় হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আরব দেশগুলোর সঙ্গে ইসরাঈলের সম্ভাব্য শান্তি প্রক্রিয়া ও এতে মরক্কোর মধ্যস্থতার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। এই বৈঠক পরবর্তী সময়ে মিশর-ইসরাঈল সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করে।[33] এই সাক্ষাতের পর রাজা হাসান দ্বিতীয় ইসরাঈল ও মিশরের মধ্যে গোপন যোগাযোগ স্থাপনে মধ্যস্থতা করেন। ১৯৭৭ সালের আগস্টে মোসাদের প্রধান আইজাক হোফি মরক্কো সফর করে রাজা হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় রাজা হাসান ইসরাঈলি প্রধানমন্ত্রীকে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের পক্ষ থেকে একটি গোপন বার্তা পৌঁছে দেন, যেখানে মরক্কোর মধ্যস্থতায় ইসরাঈলের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসতে মিশরের সম্মতির কথা জানানো হয়।[34]

১৯৭৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ইসরাঈলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে দায়ান ও মিশরের উপ-রাষ্ট্রপতি হাসান তাহামির মধ্যে বৈঠক হয়। এতটাই গোপন রাখা হয়েছিল যে মিশরে কেবল তিনজন মানুষ—প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, উপ-রাষ্ট্রপতি হাসান তাহামি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহমি—এ বৈঠকের খবর জানতেন। এমনকি বলা হয় যে, আমেরিকাও এ বিষয়ে অবগত ছিল না। এই বৈঠকে হাসান তাহামি ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী মেনাখেম বেগিনের সঙ্গে সাদাতের সাক্ষাতের প্রস্তাব দেন এবং শর্ত রাখেন যে ইসরাঈল সিনাই উপদ্বীপ থেকে সরে দাঁড়াবে। বৈঠকে ইসরাঈল-মিশর সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের বিষয়ে আলোচনা

[33] মরক্কো-ইসরাঈল স্বাভাবিকীকরণ: রাবাতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতা — আবদেল কাদির আবদের রহমান, Middle East Eye

[34] The Moroccan connection — The Jerusalem Post

হয় এবং তাহামি প্রতিশ্রুতি দেন, পাঁচ বছরের মধ্যে সিনাই থেকে ইসরাঈল সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহার করলে মিশর ইসরাঈলের সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে। ইসরাঈলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশে দায়ান - মেনাখেম বেগিন ও সাদাতের সাক্ষাৎ নিয়ে সম্মতি জানান, কিন্তু সিনাই থেকে ইসরাঈলি সেনা প্রত্যাহারের ব্যাপারে ইতিবাচক কোনো জবাব দেননি।[35] রাজা হাসান তাহামির ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তার মতে সিনাই থেকে ইসরাঈলের প্রত্যাহারের শর্তে তাহামির কিছুটা নমনীয় হওয়া উচিত ছিল। আলোচনাটি ফলহীনভাবে শেষ হয়। তবে মাত্র দুই মাস পর প্রেসিডেন্ট সাদাত সরাসরি জেরুজালেম সফরে যান এবং বেগিনের সঙ্গে আলোচনার সূচনা করেন, যার ফলে ১৯৭৯ সালে মিসর ও ইসরাঈলের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

## মরক্কো সফরে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী

১৯৮৬ সালের ২১ জুলাই ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজ মরক্কো সফর করেন এবং রাজা হাসান দ্বিতীয়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এটি কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় সরকারি সফর। এর আগেরটি ছিল ১৯৭৭ সালে বেগিনের মিসর সফর, যা-ও মূলত হাসান দ্বিতীয়-এর মধ্যস্থতার ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

[35] September 16, 1977 – Moshe Dayan – Hassan Tuhami Secret Morocco Meeting about Direct Israel-Egyptian Negotiations — Center for Israel Education

এই সফর কোনো নির্দিষ্ট আলোচনার জন্য নয়, বরং প্রতীকী ও পরীক্ষামূলক উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল—দেখার জন্য যে প্রকাশ্য যোগাযোগে স্থানীয় ও মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া কী হয়। প্রতীকীভাবেই হাসান দ্বিতীয় এখানে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পিএলও-এর সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব তোলেন, যা শিমন পেরেজ প্রত্যাখ্যান করেন।

মরক্কোর অভ্যন্তরে সরকারি মিডিয়ায় সফরের ঘোষণা দেওয়া হয়নি, তবে খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয়, স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে কোনো বড় প্রতিবাদ দেখা যায়নি। আরব বিশ্বে কেবল সিরিয়া এটিকে মরক্কোর বিশ্বাসঘাতকতা আখ্যা দিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আলজেরিয়া, লিবিয়া ও ইরাক সমালোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে, অন্যদিকে জর্ডান ও সৌদি আরব নীরব থাকে। কোনো লিখিত চুক্তি না হলেও, ইসরাঈলের জন্য এ সফর ছিল সাফল্যজনক, কারণ এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়া। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখে ইসরাঈল যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে ওঠে।

## অসলো চুক্তির পর আইজাক রবিনের মরক্কো সফর

১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে ইসরাঈল ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (PLO) মধ্যে অসলো–প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে উভয় পক্ষ একে অপরের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয় এবং পশ্চিম তীরের কিছু অংশ ও গাজা নিয়ে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে সমঝোতায় পৌঁছে। এই সুযোগে প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিন আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক

পুনঃস্থাপনে উদ্যোগ নেন। যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে তিনি প্রথমেই মরক্কো যান। সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেজ।

রাজা হাসান দ্বিতীয় রবিনকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান, হিব্রু ভাষায় ইহুদীদের নববর্ষের শুভেচ্ছা দেন এবং পূর্ণ রাষ্ট্রপ্রধান-সম মর্যাদা প্রদান করেন। এর মাধ্যমে তিনি ইঙ্গিত দেন যে মরক্কো এখন প্রকাশ্যে ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক চালাতে প্রস্তুত। সফরের অংশ হিসেবে ইসরাঈলি প্রতিনিধিদল কাসাব্লাঙ্কার একটি সিনাগগ এবং পরবর্তীতে হাসান দ্বিতীয় মসজিদ পরিদর্শন করে। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ইসরাঈল ফিরে যায়।[36] ফেরার পর রবিন তাঁর দুই উপদেষ্টাকে মরক্কো পাঠান, যাতে রাজাকে অসলো চুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো যায়। কারণ তখন পিএলও-এর সঙ্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল এবং ইসরাঈল রাজা হাসানের সমর্থন চাইছিল।

মরক্কোতে বৈঠকের সময় রাজা হাসান দ্বিতীয় - ইয়াসির আরাফাতকে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি জানান, মাহমুদ আব্বাস তার সঙ্গে দেখা করে বলেছেন:

“ইসরাঈলিদের অবস্থান সঠিক, আর আমাদেরটি ভ্রান্ত। আরাফাত এমনভাবে কথা বলেন যেন এটি পূর্ণাঙ্গ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র, অথচ আমরা জানি এটি কেবল একটি অন্তর্বর্তী ধাপ। আসল সমস্যা হলো করিডর বা চলাচলের পথের নিয়ন্ত্রণ। যার হাতে করিডর থাকবে, তার হাতেই

[36] Rabin Makes Surprise Visit to Morocco: Diplomacy: Israeli officials say recognition is virtually certain in wake of symbolic meeting with King Hassan, by Michael Parks, 15 September 1993 – Los Angeles Times

নিরাপত্তার চাবি থাকবে। করিডর দিয়ে ঢোকা মানে সরাসরি তেলআবিবে প্রবেশ করা।"

রাজা হাসান আরাফাতকে 'স্বৈরাচারী' আখ্যা দেন, যিনি সকলকে উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন। তিনি এমনকি বলেন, আরাফাতকে পিএলও থেকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত এবং রবিনকে পরামর্শ দেন নির্ধারিত সময়ে আরাফাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করতে, বরং বিলম্ব ঘটিয়ে তাকে চাপে রাখা ভালো। প্রয়োজনে তিনি নিজেই আরাফাতের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বার্তাবাহক পাঠাতে প্রস্তুত। পরে রবিনের প্রতিনিধি মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করেন। আব্বাস রাজা হাসানের বর্ণনা সমর্থন করেন এবং আরাফাতের কর্মকাণ্ডে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, আরাফাত অসলো চুক্তিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করছেন এবং তাকে (আব্বাসকে) প্রকাশ্যে অংশ নিতে বললেও তিনি গোপনে কাজ চালিয়ে যাবেন। আব্বাস আরও বলেন, রবিন ও আরাফাতের সাক্ষাৎ তাড়াহুড়ো করে হওয়া উচিত নয়, বরং কিছুটা বিলম্ব ঘটালে আরাফাতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে এবং ইসরাঈল তার দাবিগুলো আদায় করতে পারবে।[37]

[37] An Israeli Official's Meeting with Moroccan King Hassan II in 1993 by Col (ret.) Dr. Jacques Neriah – Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs

## মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন (MENA Summit)

১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে ইসরাঈল ও জর্ডানের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর, মরক্কোর রাজা (শাহ) হাসান দ্বিতীয় সুযোগটি কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সহযোগিতায় ৩০ অক্টোবর ১৯৯৪-এ কাসাব্লাঙ্কা শহরে এক শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইসরাঈল, জর্ডান, মিশর, তিউনিসিয়া, মরক্কোসহ ৬১টি দেশ থেকে আগত দুই হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, ইসরাঈলি প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিন এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নেতা ইয়াসির আরাফাতও উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলনকে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক বলা হয়, কারণ এটাই ছিল প্রথমবারের মতো ইসরাঈলি ও আরব নেতাদের কোনো প্রকাশ্য ফোরামে একসঙ্গে বসা। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ওসলো চুক্তি ও জর্ডান–ইসরাঈল শান্তিচুক্তিকে সামনে রেখে ইসরাঈল এবং মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ।[38]

আরব লীগের পক্ষ থেকে ১৯৪৮ সাল থেকেই সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উপর ইসরাঈলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৫০-এর দশকে এই নিষেধাজ্ঞা আরও কড়াকড়ি করা হয় এবং ইসরাঈলের সঙ্গে ব্যবসা করে এমন সব কোম্পানিকেও বয়কটের আওতায় আনা হয়। কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে এই বিষয়টি আলোচনায় আসে। ফলে উপসাগরীয়

[38] Casablanca Declaration – Mideast/North Africa Economic Summit, Ministry of Foreign Affairs, Government of Israel

সহযোগিতা পরিষদের দেশগুলো—বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত—সম্মেলন শুরুর আগে ইসরাঈলের সঙ্গে বাণিজ্যরত কোম্পানিগুলোর ওপর থেকে বয়কট তুলে নেয়।[39] সম্মেলনের শেষদিকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৯৫ সালে পরবর্তী সম্মেলন ওমানে অনুষ্ঠিত হবে।

## মরক্কো ও ইসরাঈলের মধ্যে আংশিক কূটনৈতিক সম্পর্কের সূচনা

এই সম্মেলনের পর মরক্কো ও ইসরাঈল আংশিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে একমত হয়।[40] মরক্কো প্রথমে জেরুজালেমে কূটনৈতিক যোগাযোগ দপ্তর খোলে, পরে তা তেল আবিবে স্থানান্তরিত হয়। অন্যদিকে ইসরাঈল রাবাতে তাদের অফিস চালু করে। এর লক্ষ ছিল বাণিজ্য, পর্যটন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি। মিশর ও জর্ডানের পর মরক্কো তৃতীয় দেশ হিসেবে ইসরাঈলের সঙ্গে এই ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করে। অল্প সময় পর কাতার ও তিউনিসিয়াও একই পদক্ষেপ নেয়। ফলে দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল অবাধে একে অপরের দেশে যাতায়াত শুরু করে। ১৯৯৯ সালের মধ্যে মরক্কোতে বছরে পঞ্চাশ হাজার ইসরাঈলি পর্যটক আসতে থাকে এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রায় ৫০ মিলিয়ন

[39] GCC announces end to boycott of Israel – Middle East business intelligence

[40] Israel and Morocco Take Fledgling Step Toward Diplomatic Relations, by Clyde Haberman, 2 September 1994 – The New York Times

ডলার অতিক্রম করে।[41] শুধু সিরিয়া ও লেবানন মরক্কোর এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে।

২২ জুলাই ১৯৯৯ সালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রাজা হাসান দ্বিতীয় মৃত্যুবরণ করেন। তার জানাযায় সারা বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতারা অংশ নেন। ইসরাঈল থেকেও প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিমোন পেরেজ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড লেভি উপস্থিত ছিলেন।

## রাজা মুহাম্মাদ ষষ্ঠ (১৯৯৯–বর্তমান)

রাজা হাসান দ্বিতীয়ের মৃত্যুর পর তার ছেলে মুহাম্মাদ ষষ্ঠ সিংহাসনে আসীন হন এবং ইসরাঈল সম্পর্কিত তার বাবার নীতি অব্যাহত রাখেন।

## দ্বিতীয় ইন্তিফাদা ও সম্পর্ক ছিন্নকরণ

জুলাই ২০০০-এ যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাম্প ডেভিড সম্মেলনে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের চূড়ান্ত সমাধান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হয়। এর পর জেরুজালেমসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ফিলিস্তিনি বিক্ষোভ শুরু হয় এবং ইসরাঈলি বাহিনীর গুলিতে শতাধিক শহীদ হন। এরই মধ্যে ইসরাঈলি

[41] Morocco, Israel: 6 decades of secret ties, cooperation, by Ahmed bin Taher, 20 December, 2020 – Anadolu Agency Turkey

প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের আল-আকসা মসজিদ সফর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তোলে। এগুলোই দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সূচনা করে।[42]

সংঘাত বৃদ্ধির ফলে যেসব মুসলিম দেশ ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগাচ্ছিল, তারা বাধ্য হয় এসব সম্পর্ক সীমিত বা পুরোপুরি ছিন্ন করতে। মরক্কোও একই সিদ্ধান্ত নেয় এবং ইসরাঈলও মরক্কোর যোগাযোগ অফিস বন্ধ করে দেয়।[43] তবুও অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় থাকে। প্রতিবছর গড়ে ৫০ হাজার ইসরাঈলি পর্যটক মরক্কো সফর করতে থাকে।[44] পাশাপাশি গোপনীয় গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সহযোগিতাও চলতে থাকে।

## ইরান ও হিজবুল্লাহ বিরোধী সহযোগিতা

ইরানে খোমেনি বিপ্লবের পর থেকে মরক্কো এবং ইরানের মধ্যে সম্পর্ক কখনও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৯৮১ সালে, রাজা দ্বিতীয় হাসান নির্বাসিত শাহ রেজা পাহলভিকে আশ্রয় দেওয়ার পর ইরান মরক্কোর সাথে সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। এক দশক পরে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়।[45] এরপর ২০০৯ সালের মার্চ মাসে ইরানের সর্বোচ্চ

[42] The Second Intafada: Background and Causes of the Israeli-Palestinian Conflict by Jeremy Pressman, 21 February 2006 – Journal of Conflict Studies

[43] Morocco's envoy arrives in Israel to reopen Liaison office, 9 February 2021 – The Times of Israel

[44] Israel, Morocco agree to normalize relations in US-broked deal, 18 December, 2020 – Al Jazeera

[45] Moroccan Premier ends visit to Iran – BBC News

নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি যখন বলেছিলেন যে বাহরাইন শাসন করার অধিকার ইরানের রয়েছে, তখন মরক্কো ইরানের সাথে সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।[46] ২০১৪ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত করা হয়েছিল, কিন্তু ২০১৮ সালে মরক্কো আবারও সম্পর্ক ছিন্ন করে; এই বলে যে, ইরান এবং লেবাননের হিজবুল্লাহ আলজেরিয়ার সহায়তায় পশ্চিম সাহারার একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পলিসারিও ফ্রন্টকে প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র সরবরাহ করছে। এরপর এখন পর্যন্ত পুনরায় সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি।

সুতরাং, ইরান-হিজবুল্লাহ ইসরাঈল ও মরক্কোর সাধারণ শত্রু এবং আলজেরিয়া মরক্কোর পুরানো প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ইরান-হিজবুল্লাহর সাথে কথিত সহযোগিতার কারণে এই দেশগুলির বিরুদ্ধে মরক্কো ও ইসরাঈলের মধ্যে গোয়েন্দা সহযোগিতা অব্যাহত ছিল।[47]

## ইসরাঈল–মরক্কো ‘নরমালাইজেশন’

মে ২০১৯ সালে, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা জ্যারেড কুশনার ‘আব্রাহাম চুক্তির’ ভিত্তি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা সফর শুরু করেন। এই সফরের অংশ হিসেবে তিনি মরক্কোতেও যান।

[46] Morocco cuts ties with Iran over Bahrain – Reuters

[47] Morocco security officials: ‘Iran, Hezbollah undermining stability with Algeria’s help’, Middle East Monitor

কুশনারের সঙ্গে রাজা মোহাম্মদ ষষ্ঠের বৈঠকে, রাজা একটি শর্ত উপস্থাপন করেন— যদি যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম সাহারার ওপর মরক্কোর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি দেয়, তবে মরক্কোর জনগণকে ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে রাজি করানো সম্ভব হবে।

ইসরাঈলি সরকারও মরক্কোর এই শর্তের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং যুক্তরাষ্ট্রকে তা মেনে নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। তবে কুশনার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব মানেননি। ফলে বিষয়টি আটকে যায়, কারণ ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন এবং কয়েকজন সিনেটর মরক্কোর দাবির বিরোধিতা করেছিলেন।[48]

এ প্রসঙ্গে আলোচনা দুই বছর ধরে চলতে থাকে। তবে ২০২০ সালে এতে গতি আসে। অবশেষে ডিসেম্বর ২০২০ সালে, আলোচনাগুলোকে 'আব্রাহাম চুক্তির' অংশ হিসেবে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। ১০ ডিসেম্বর ২০২০ সালে ট্রাম্প ঘোষণা করেন— যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম সাহারার ওপর মরক্কোর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি দেওয়ার বিনিময়ে মরক্কো ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করছে।

২২ ডিসেম্বর ২০২০ সালে রাবাতে ইসরাঈলি ও মরক্কান কর্মকর্তাদের মধ্যে স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে মরক্কো আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী ষষ্ঠ আরব রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

[48] Inhofe slams Trump administration on Western Sahara policy, 6 February, 2021 – Politico

এই চুক্তির অধীনে প্রথমে মরক্কো ও ইসরাঈল তাদের কূটনৈতিক যোগাযোগ দপ্তরগুলো পুনরায় সচল করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরে ধাপে ধাপে উভয় দেশে পূর্ণাঙ্গ দূতাবাস স্থাপন করার পরিকল্পনা হয়। এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম সাহারার ওপর মরক্কোর সার্বভৌমত্বের দাবি মেনে নেয় এবং অঞ্চলটিকে মরক্কোর ভূখণ্ড হিসেবে ঘোষণা করে।[49]] এটা উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তরাষ্ট্র গত ত্রিশ বছর ধরে পশ্চিম সাহারার সংকট সমাধানের উপায় হিসেবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট আয়োজনের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আসছিল। কিন্তু কেবল ইসরাঈল–মরক্কো সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্র তার ত্রিশ বছরের এই অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ায়।

এটিও উল্লেখযোগ্য যে, মরক্কো ও ইসরাঈলের মধ্যে স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি স্বাক্ষরের সময় রাজা মোহাম্মদ ষষ্ঠের অধীনে ক্ষমতাসীন ছিল একটি ইসলামপন্থি গণতান্ত্রিক দল হিজবুল আদালাহ ওয়াত্তানমিয়া (Justice and Development Party)। তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সাদেদ্দীন উসমানি। অথচ ক্ষমতায় আসার আগে এই দল ইসরাঈলের সঙ্গে মরক্কোর সম্পর্কের তীব্র সমালোচনা করত এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানাত।[50] এই সম্পর্কের ফলে মরক্কো ও ইসরাঈলের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ২০২৩ সাল নাগাদ উভয় দেশের বার্ষিক বাণিজ্য পৌঁছে যায় ১১ কোটি ৬৭ লাখ ডলারে। এর পাশাপাশি সাইবার সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা

[49] Morocco, Israel normalize ties as US recognizes Western Sahara, 16 March 2021 – The Jerusalem Post

[50] Morocco: Ruling party okays Israel normalization deal, 24 December 2024 – Anadolu Agency Turkey

খাতেও একাধিক নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে ইসরাঈল মরক্কোর জন্য অস্ত্রের সবচেয়ে বড় সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়েছে।

## ‘তুফান আল-আকসার’ পর মরক্কো–ইসরাঈল সম্পর্ক

‘তুফান আল-আকসা’ অভিযানের পর এবং গাজায় ইসরাঈলের ব্যাপক যুদ্ধের সময় মরক্কোতে জনগণের পক্ষ থেকে তীব্র বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। তারা সরকারের কাছে ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি তোলে। কিন্তু মরক্কো সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, ২০০০ সালের দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময়ের মতো এবার আর কোনো অবস্থাতেই ইসরাঈলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে না।

বরং সম্পর্ক ছিন্ন করা তো দূরের কথা, এই সময়ে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার হয়েছে। ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ কোটি ৩২ লাখ ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ৬৪ শতাংশ বেশি। একই বছরে ইসরাঈল মরক্কোর ভেতরে একটি ড্রোন তৈরির কারখানা উদ্বোধন করে। ওই বছরেই মরক্কো ইরানকে নজরদারিতে রাখার উদ্দেশ্যে ইসরাঈল থেকে এক বিলিয়ন ডলারের একটি গোয়েন্দা স্যাটেলাইট ক্রয় করে।[51]

[51] How the Gaza war brought Morocco and Israel closer by Sarah Zaaimi, 21 January 2025 – Atlantic Council

## গাজা যুদ্ধ চলাকালে সরাসরি সহায়তা

শুধু সম্পর্ক বজায় রাখাই নয়, গাজার যুদ্ধে ইসরাঈলকে সরাসরি সহায়তাও দেয় মরক্কো। ইসরাঈলগামী অস্ত্রবাহী জাহাজগুলো মরক্কোর বন্দর ব্যবহার করে আসছে, এমনকি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানের যন্ত্রাংশ বহনকারী জাহাজও এর অন্তর্ভুক্ত।[52] সাম্প্রতিক গাজা যুদ্ধে নিরস্ত্র বেসামরিক নাগরিক, নারী, শিশু এবং বিপুল সংখ্যক চিকিৎসা কর্মীকে লক্ষ করে হত্যা করার জন্য কুখ্যাত গোলানি ব্রিগেড ২০২৫ সালের মে মাসে মরক্কোতে অনুষ্ঠিত 'আফ্রিকান লায়ন ২০২৫' সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে 'নগর যুদ্ধ', 'অপ্রচলিত যুদ্ধ' এবং 'ভূগর্ভস্থ টানেল অপারেশন'-এর জন্য মহড়া পরিচালিত হয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায়, মরক্কো গাজায় তাদের নৃশংসতা ও গণহত্যা আরও ভালোভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইসরাঈলি সৈন্যদের প্রশিক্ষণের সুবিধা দিচ্ছে।[53] এই মহড়ায় ইসরাঈল ছাড়াও মিশর, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া, তিউনিসিয়া, ইউএই, আলজেরিয়া, কাতার ও তুরস্কসহ চল্লিশটি দেশ অংশগ্রহণ করে।[54]

---

[52] Fuelling the 'machinery of genocide': Morocco's backdoor support for Israel's war on Gaza by Caroline Dupuy, 1 July 2025 – Middle East Eye

[53] Golani Brigade in Morocco: How the Rabat Regime is Complicit in Gaza Genocide by Robert Inlakesh, 28 May 2025 – The Palestine Chronicle

[54] African Lion 25: Largest U.S.-led military exercise in Africa begins in four nations, 10 April 2025 – Military Africa

## উপসংহার

মরোক্কোর প্রথম কিবলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার এই গল্প হৃদয় বিদারক। রাজা দ্বিতীয় হুসেন হোক বা রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ, এই মরক্কোর শাসকরা তাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য সর্বদা ফিলিস্তিনিদের রক্তে তাদের হাত রঞ্জিত করেছেন। ডলারের বিনিময়ে মরক্কোর ইহুদীদের ইসরাঈলে অভিবাসনকে সহজতর করা, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে জয়লাভের জন্য আরব লীগের সভায় গুপ্তচরবৃত্তি করা, ফিলিস্তিনি ও মুসলিম অঞ্চলগুলি ইসরাঈলের কাছে হস্তান্তর করা, মিশরকে ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে রাজি করানো, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে ইসরাঈলের দাবির কাছে মাথা নত করতে বাধ্য করা, ইসলামী দেশগুলির বিরুদ্ধে ইসরাঈলের সাথে নিরাপত্তা সহযোগিতা ও গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি করা থেকে শুরু করে গাজায় চলমান গণহত্যার জন্য অস্ত্র ও সামরিক প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদান করা—এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে মরক্কোর শাসকরা বারবার প্রমাণ করেছে যে, ক্ষমতা ও সম্পদ তাদের কাছে নিপীড়িতদের কান্না এবং আল-আকসা মসজিদের পবিত্রতার চেয়ে বেশি মূল্যবান। আজ, যখন গাজায় নির্যাতিত শিশু, নারী ও বৃদ্ধদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, যখন তারা বোমা হামলা ও অনাহারের কারণে তাদের জীবন দিচ্ছে, তখন মরক্কোর বন্দর এবং প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রগুলি এই নিষ্ঠুরতার হাতিয়ার হয়ে উঠছে। এগুলো কেবল একটা দেশের বিশ্বাসঘাতকতার গল্প নয়, বরং পুরো উম্মাহর উদাসীনতার প্রতিচ্ছবি। আরও ভণ্ডামি হলো, এই একই বিশ্বাসঘাতকরা এখনও নিজেদেরকে আল-আকসা মসজিদের রক্ষক এবং ফিলিস্তিনি মুসলমানদের অধিকারের সমর্থক বলে দাবি করে। এটা ইসলামী বিশ্বের শাসকদের সবচেয়ে বড় ভণ্ডামি যে, যারা (জর্ডান এবং মরক্কো) আল-আকসা মসজিদের সাথে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা

করেছে তারাই কেবল আল-আকসা মসজিদের রক্ষক হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে।

এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়ানোর সময় কি এখনো আসেনি? ফিলিস্তিনের যন্ত্রণা কি আমাদের যন্ত্রণা নয়? আসুন, আমরা এই কালো অধ্যায় উল্টে দেওয়ার শপথ করি। কারণ বিশ্বাসঘাতকতার সামনে নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তা—নিজেই এক বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা!

# আমার হেঁচকি কোনো দিন কোনো মুক্তপুরুষকে দূরদেশ থেকে এনে দিতে পারল না!

*গাজাবাসী যে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তার কয়েকটি ঝলক*

**—কাজী আবু আহমদ**

গাজার এক চিকিৎসক হিসেবে সেবাদানকারী ব্রিটিশ ডাক্তার নিক মেইনার্ড বলেন— "আমি এবং আমার সহকর্মীরা প্রত্যেকেই এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে, তথাকথিত ত্রাণকেন্দ্রগুলোতে (GHF) খাদ্য ও সাহায্য সংগ্রহে যাওয়া নিরস্ত্র সাধারণ মানুষদের ইসরাঈলি সেনারা পরিকল্পিতভাবে গুলির টার্গেট বানাচ্ছে। আর তাদের নিশানায় সবচেয়ে বেশি পড়ছে শিশু আর কিশোররা।

এ সাক্ষ্য আমরা পেয়েছি আমাদের কাছে চিকিৎসার জন্য আসা আহতদের ক্ষতচিহ্ন থেকে, তাদের স্বজনদের বিবরণ থেকে এবং এমনকি আমাদের কিছু সহকর্মীর কাছ থেকেও, যারা সরাসরি এসব ত্রাণকেন্দ্রে গিয়েছিলেন। অধিকাংশ আহতের শরীর গুলিতে বিদ্ধ, কেউ কেউ ড্রোন থেকে চালানো গুলিতে ক্ষতবিক্ষত। প্রতিদিন আসা আহত শিশুদের শরীরে একই ধরনের আঘাত আমরা দেখতে পাই। একদিন সবার মাথা বা গলায় গুলি লেগেছে, পরদিন কারও না কারও পেট ফুঁড়ে গুলি ঢুকেছে, তার পরদিন বুক লক্ষ করে গুলি, আবার আরেকদিন যৌনাঙ্গে আঘাত। যেন প্রতিদিন তারা

শরীরের একটি নির্দিষ্ট অংশকে টার্গেট করে! একেবারে স্পষ্ট বোঝা যায়— শিশুদের শরীরকে তারা এক প্রকার ভিডিও গেমের মতো ব্যবহার করছে, আজ মাথায় মারবে, কাল বুকে, পরশু অন্য কোথাও।"

একটি হৃদয় বিদারক কাহিনি প্রকাশ করেন অ্যান্থনি অ্যাগুইলার, যিনি মার্কিন নাগরিক হয়ে ইসরাঈলি ও মার্কিন সহায়তায় পরিচালিত ওই কেন্দ্রগুলোতে চাকুরি করছিলেন। বিবেকের তাড়নায় তিনি নীরবতা ভেঙে বললেন এক শিশু আমির-এর গল্প, যে সাহায্য নিতে এসেছিল, কিন্তু প্রাণ হারাল। তিনি বলেন— "২৮ মে ত্রাণ বিতরণের স্থানে এক ক্ষুদ্রকায় শিশু, নাম তার আমির, আমার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি ভেবেছিলাম সে হয়তো আরও কিছু সাহায্য চাইছে। লজ্জা পেলাম, কারণ দেওয়ার মতো আর কিছু ছিল না। আমি তাকে তা-ই বললাম। কিন্তু সে আবারও হাত বাড়ালে আমি তাকে কাছে টেনে নিলাম। তার হাতে কোনো ত্রাণের বাক্স ছিল না। পড়ে থাকা জিনিসপত্রের ভেতর থেকে সে কেবল অর্ধেক ছেঁড়া চালের বস্তা আর আধা কেজি ডাল পেয়েছিল। এ-ই ছিল তার সম্বল। সে আমার হাত চুমু খেয়ে বলল— 'ধন্যবাদ'। আমি তার কাঁধে হাত রেখে বললাম— 'তুমি মানুষ, তোমার কোনো দোষ নেই। দুনিয়া তোমার কথা ভাবে।' এরপর সে তার হাড্ডিসার হাতদুটো দিয়ে আমার মুখ জড়িয়ে ধরল, গালে চুমু খেল এবং ইংরেজিতে বলল— 'Thank you'। শিশুটি খালি পায়ে ছিল। গায়ে তার ছেঁড়া, ঢোলা জামাকাপড়। এমন শীর্ণকায় যে, কাপড়ও তার গায়ে মানাচ্ছিল না। সে কোনো বাক্স পেল না, পেল কেবল চাল আর ডালের সামান্য ভগ্নাংশ। তারপরও সে কৃতজ্ঞ ছিল। সে খালি পায়ে বারো কিলোমিটার হেঁটে এই কেন্দ্রে পৌঁছেছিল। যা পেল তাই নিয়েই সে সন্তুষ্ট, তাই নিয়েই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তারপর যখন সে ফিরে

গেল ভিড়ের দিকে, হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মরিচ স্প্রে, টিয়ার গ্যাস, স্টান গ্রেনেড আর গুলি। গুলি ছোড়া হচ্ছিল আকাশে এবং মানুষের পায়ের দিকে। আতঙ্কে আমির দৌড় দিল। ইসরাঈলি সৈন্যরা মেশিনগান থেকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাচ্ছিল নিরস্ত্র ফিলিস্তিনি জনতার দিকে। মানুষজন একে একে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল। আর সেই পতিতদের ভিড়েই পড়ে গেল আমির। খালি পায়ে বারো কিলোমিটার পথ পেরিয়ে সে এসেছিল খাদ্যের খোঁজে। সামান্য কিছু চাল-ডাল পেল, কৃতজ্ঞতা জানাল— তারপর সে নিহত হলো।" অ্যান্থনি অ্যাগুইলারের সাক্ষ্য আসলে অনেক দীর্ঘ। তিনি তাঁর চোখে দেখা গাজার পরিকল্পিত গণহত্যার বিবরণ দিয়েছেন। উপর্যুক্ত কাহিনি তাঁর বয়ানের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আজ গাজায় আমাদের শিশুদের রক্ত নিয়ে খেলা হচ্ছে। তাদের ওপর নিশানা ঠিক করার অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ চালানো হচ্ছে। তাদেরকে ক্ষুধায় মারা হচ্ছে। অথচ আমরা নিজেদের ঘরে বসে নির্লিপ্তভাবে সান্ত্বনার বাঁশি বাজাচ্ছি। আজ যদি তারা পরীক্ষায় পড়ছে, তবে কাল আমরা-ও পড়ব। সে দিন আর দূরে নয়!

# কোনো গুণ্ডা নিজের জোরে গুণ্ডা হয় না

**—ওয়াসআতুল্লাহ খান**

১৯৪৫ সালের মে মাসে হিটলার আত্মহত্যা করলেন। প্রায় এক মাস পর আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের চোখে নাজি বিরোধী জোটের চতুর্থ অংশীদার সোভিয়েত ইউনিয়ন হঠাৎ করে এক 'লাল মতাদর্শী ও সামরিক ভূত' হয়ে উঠল। ফলে জুলাই ১৯৪৫-এ চার্চিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে একটি যুদ্ধ পরিকল্পনা পেশ করলেন। নাম দেওয়া হলো 'অপারেশন আনথিঙ্কেবল'। অর্থাৎ, পশ্চিম ইউরোপ যদি স্টালিনের কাছ থেকে অস্তিত্বের হুমকির মুখে পড়ে, তবে মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও কিয়েভে পারমাণবিক বোমা ফেলা হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বোমা ফেলা হয়নি, কিন্তু কোরীয় উপদ্বীপে স্টালিনের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে এবং সোভিয়েতদের 'সামরিক সীমা' বুঝিয়ে দিতে আমেরিকা ১৯৪৫ সালের ০৬ ও ০৯ আগস্ট হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে বোমা ফেলল। এ ছিল আসলে একটি ব্যবহারিক হুমকি—"পারমাণবিক শক্তির বিহীন সোভিয়েত ইউনিয়ন যেন ইউরোপ নিয়ে কোনো কু-স্বপ্নও না দেখে।"

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো গঠিত হলো। একই সময়ে পেন্টাগন একটি প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরি করল—'অপারেশন ড্রপ শট'। এর আওতায় যদি

সোভিয়েতরা পশ্চিম ইউরোপে অগ্রসর হয়, তবে তাদের একশত শহরে তিনশত পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করে সোভিয়েত হুমকি একেবারে শিকড় থেকে নির্মূল করে দেওয়া হবে। কিন্তু পরিকল্পনাটি কার্যকর হবার আগেই পাল্টে গেল দৃশ্যপট। ন্যাটো গঠনের মাত্র সাড়ে চার মাস পর, ১৯৪৯ সালের ২৯ আগস্ট, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজস্ব প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাল—কিছু জার্মান বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীর সহায়তায়—যাদের মধ্যে অনেককেই আগে আমেরিকাই আশ্রয় দিয়েছিল। তারা হয়ে উঠল বিশ্বের দ্বিতীয় পারমাণবিক শক্তি।

১৯৬২ সালে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আমেরিকার মাত্র সত্তর মাইল দূরের কিউবায় পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বসাতে শুরু করল, তখন খেলা পাল্টে গেল। উত্তেজনা কমাতে আমেরিকা ধাপে ধাপে সোভিয়েতদের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস নিয়ে আলোচনায় বসতে বাধ্য হলো। ইতিহাসে এই প্রক্রিয়াটি 'দেতান্ত' নামে চিহ্নিত।

এ গল্প থেকে শিক্ষাটা স্পষ্ট—যতদিন পারমাণবিক বোমা একমাত্র আমেরিকার হাতেই ছিল, ততদিন তাদের মিথ্যা প্রচারণা সত্ত্বেও আসলে কোনো 'লাল সোভিয়েত হুমকি' ছিল না। বরং বিপরীতে সোভিয়েতরাই আশঙ্কা করছিল আমেরিকার পারমাণবিক হামলার। কিন্তু একবার সোভিয়েতরা নিজেরাও পারমাণবিক শক্তিধর হয়ে উঠলে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হলো সন্ত্রাসের ভারসাম্য—অর্থাৎ, যেকোনো পারমাণবিক শক্তিকে তখন দশবার ভেবে নিতে হচ্ছিল আক্রমণের আগে।

আজকের মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যপটও সেই সূত্রেই দেখা উচিত। এ অঞ্চলে একমাত্র গোপন পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হলো ইসরাঈল। পশ্চিমা বিশ্ব সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ইসরাঈলকে এ ব্যাপারে সহায়তা করেছে।

ষাট বছর আগে থেকেই সবার জানা ছিল—ইসরাঈলের ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডারে আছে পারমাণবিক অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা। তবু কখনো কোনো আন্তর্জাতিক চাপ আসেনি যে, মিসর, সিরিয়া, জর্ডান, সৌদি আরব, ইরাক কিংবা ইরানের মতো ইসরাঈলকেও পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি)-র সদস্য হতে হবে এবং তার 'শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি' ও আইএইএ-এর তত্ত্বাবধানে থাকবে

এটি নথিভুক্ত সত্য—১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে, শত্রুপক্ষ যদি তাদের কল্পিত রেড লাইন অতিক্রম করে, তবে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কথা সিরিয়াসলি বিবেচনা করেছিল ইসরাঈল। সর্বশেষ হুমকি এসেছে ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে, যখন ইসরাঈলের সংস্কৃতি মন্ত্রী এমখাই এলিয়াহু এক রেডিও সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন— "গাজায় পারমাণবিক বোমা ফেলার কথাও ভাবা যেতে পারে।" প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু তার পর শুধু এটুকুই করলেন যে, মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভার একটি বৈঠকে অংশ নিতে বারণ করলেন; কিন্তু পদ থেকে সরাননি।

ভাবুন তো, মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোনো দেশ থেকে এ ধরনের হুমকি এলে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়া কেমন হতো! অথচ পশ্চিমা বিশ্ব বরাবরই এই সুর তোলে—ইসরাঈলের হুমকি ছিল সাদ্দাম হোসেন, এখন নাকি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বিশ্বের জন্য হুমকি।

অর্থাৎ, বারবার প্রমাণিত হচ্ছে—কোনো অঞ্চলে যদি একটিই মাত্র পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র থাকে, তবে সেটি বৈধ-অবৈধ সবভাবে প্রতিবেশীদের ব্ল্যাকমেইল করতে পারে। এ দাপট থামানোর দুটি পথ আছে—প্রথমত, প্রত্যেক রাষ্ট্রকে পারমাণবিক অস্ত্র রাখার অনুমতি দিতে হবে, যাতে সন্ত্রাসের ভারসাম্য তৈরি হয়। দ্বিতীয়ত, পুরো অঞ্চলকে

পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত ঘোষণা করতে হবে। ইসরাঈল বাদে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার সব রাষ্ট্রই এই প্রস্তাবে একমত।

পশ্চিম চাইলে ইসরাঈলের ওপর চাপ দিয়ে সহজেই তা কার্যকর করতে পারে। কিন্তু জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিক মের্জ যেমন বলেছেন—"ইসরাঈল আমাদের হয়ে নোংরা কাজগুলো করছে।" আমেরিকাসহ পুরো পশ্চিমা বিশ্ব এই বিষয়ে একমত— মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলকেই সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক শক্তি হিসেবে রাখতে হবে। ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যা-ই করুক, কিংবা যে কোনো আরব বা অ-আরব রাষ্ট্রের কাছ থেকে সামান্যতম 'ভয়' পেলেও আগ বাড়িয়ে আক্রমণ চালাক—সবই ইসরাঈলের তথাকথিত 'আত্মরক্ষার অধিকার'-এর আওতায় পড়ে। বাস্তবতা হলো—ইসরাঈল ছাড়া বাকি সব আঞ্চলিক রাষ্ট্রই এনপিটি ও আইএইএ-র সদস্য, তাদের কর্মসূচি আন্তর্জাতিক নজরদারির অধীনে। কিন্তু পশ্চিমাদের জন্য আসল বিষয় হলো—ইসরাঈলের আশপাশে কেউ যেন শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক ক্ষমতাও না পায়। কারণ, কাল যদি তাদের মানসিকতা বদলায়, তবে হয়তো ইসরাঈলের আঞ্চলিক দাদাগিরিকে তারই মতো চ্যালেঞ্জ জানাবে।

এ তো সবারই জানা—কোনো দালাল, গলির গুণ্ডা বা রাষ্ট্রীয় বদমাশ, কোনো বড় ডন বা মাফিয়া-পৃষ্ঠপোষকের আশ্রয় ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। এই 'সেবার' বিনিময়ে সে দশটা কাজ ডনের জন্য করবে, আর পাঁচটা নিজের জন্য। এভাবে পৃষ্ঠপোষক ও নোংরা কাজের ঠিকাদার ধীরে ধীরে একে অপরের প্রয়োজনের বন্দী হয়ে যায়। সময়ের পালাবদলে যখন দুর্বল হতে থাকে, তখন নতুন কোনো শক্তি বা জোটের খাদ্যে পরিণত হয়।

ভাবুন তো—বর্তমান গতিতে চলমান ধারায় চলতে থাকলে আগামী পঞ্চাশ বছরে চীন কোথায় থাকবে, আর আমেরিকা, ইউরোপ ও ইসরাঈল কোথায়

দাঁড়াবে? সাত হাজার বছর ধরে সভ্যতার এই উত্থান-পতনের মিউজিক্যাল চেয়ার চলছে। জঙ্গল হোক বা জনপদ—প্রকৃতির নিয়ম সবার জন্য একই।

(*এই প্রবন্ধ একটি সমসাময়িক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। চয়ন করা প্রবন্ধসমূহ সাময়িকীর সম্পাদকীয় নীতির আলোকে প্রকাশ করা হয়।* —সম্পাদক)

# গাজা: নীরবতা মানে অপরাধে শরীক হওয়া!

**— আদনান হামিদান**

গাজায় এখন আর বোমার শব্দে সকাল শুরু হয় না, শুরু হয় ক্ষুধার নিঃশব্দ আর্তনাদে।

মা ঘুম থেকে ওঠেন, কিন্তু তার সন্তানদের জন্য দুধ নেই। শিশুরা খালি পেটের যন্ত্রণা ঘোচাতে আবর্জনার স্তুপে খাবারের টুকরো খুঁজে বেড়ায়— এর আগেই আবার বোমা নেমে আসে এবং যা সামান্য আশা বাকি থাকে, তাকেও মাটিচাপা দিয়ে দেয়।

এটি কোনো অতিরঞ্জন নয়, একেবারে অন্ধকার এবং নথিভুক্ত বাস্তবতা। গাজা শুধু বোমার নিচে পিষ্ট নয়, অবরোধেরও শিকার। এখন সবচেয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টিকারী অস্ত্র হলো ক্ষুধা। কারণ ক্ষুধা এক নীরব অস্ত্র— পৃথিবী তাকায় না, যেন ধীরে ধীরে আসা মৃত্যু কোনো মূল্যই বহন করে না। মাসের পর মাস গাজার মানুষ দ্বিমুখী অবরোধের শিকার। একদিকে প্রতিদিনের বোমাবর্ষণ, অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী উদাসীনতা। সীমান্ত পথগুলো বন্ধ। খাবার খুঁজতে বের হওয়াদের গুলি করে মারা হয়। ত্রাণের সাপ্লাই লাইনগুলোকে সুচিন্তিতভাবে ভেঙে ফেলা হয়েছে। রুটি এখন এক প্রায় কল্পকাহিনী, পানি প্রতিদিনের যুদ্ধ, আর ওষুধ বিরল এক অলৌকিকতায় পরিণত হয়েছে।

যা ঘটছে তাকে শুধু 'মানবিক বিপর্যয়' বললে তার আসল অর্থ ফুটে ওঠে না। এখন যা চলছে তা হলো ক্ষুধার্ত করে হত্যার সচেতন পরিকল্পনা, যা বিশ্বের প্রতিটি আইনগত ও নৈতিক সংজ্ঞায় নিঃসন্দেহে 'গণহত্যা'।

গোপনে বের করা ফুটেজে দেখা যায়—রুটির লাইনে দাঁড়ানো শিশুরা ক্ষুধায় অচেতন হয়ে পড়ছে। পরিবারগুলো ঘাস খেয়ে বাঁচতে বাধ্য হচ্ছে। মায়েরা একটি রুটি চারটি ক্ষুধার্ত সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দেন। এদের মৃত্যুর কারণ কেবল বোমা নয়, বরং ধীরে ধীরে পুষ্টিহীনতায় ক্ষয় হতে থাকা শরীরের অবসান। গাজার মানুষ কোনো অসম্ভব কিছু চাইছে না—তারা চাইছে কেবল বিশ্বের বিবেকের এক ক্ষুদ্র অংশ। কিন্তু এই মুহূর্তে ক্ষুধার চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক হলো —নীরবতা।

আক্রমণের প্রথম দিককার দিনগুলোতে পশ্চিমা নেতারা সাবধানী ভাষায় বিবৃতি দিয়েছিলেন: সংযমের আহ্বান, আন্তর্জাতিক আইন মনে করিয়ে দেওয়া, উদ্বেগ প্রকাশ। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরগুলোও এখন থেমে গেছে, বিস্মৃত হয়েছে, পুরোনো প্রেস রিলিজের পাতায় চাপা পড়ে আছে। কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি, কোনো নীতি বদলানো হয়নি। বরং, ইসরাঈলের প্রতি সমর্থন বেড়েছে। কিছু সরকার এমনকি গাজার ধ্বংস যজ্ঞের মাঝেই জাতিসংঘের প্রধান ত্রাণ সংস্থা UNRWA-এর অর্থায়ন স্থগিত করেছে। কখনো শুনেছেন কি—কোনো সরকার তখনই কোনো ত্রাণ সংস্থার তহবিল কেড়ে নেয় যখন শিশুরা ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে? এটিই ঘটেছে—আর ঘটেছে নিঃশব্দে, কোনো প্রতিক্রিয়া ছাড়াই। যেমন নেলসন ম্যান্ডেলা একবার বলেছিলেন:

"মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া মানেই তার মানবতাকে অস্বীকার করা।"

আজ গাজাকে শুধু বোমায় নয়, ক্ষুধায়ও শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। এটি এক প্রকারের সমষ্টিগত শাস্তি, যা সম্ভব হয়েছে এক আন্তর্জাতিক নীরবতার কারণে। আপনি হয়তো এই ঐকমত্যকে সরকারি বিবৃতিতে পাবেন না, কিন্তু তা স্পষ্ট—প্রতিটি বন্ধ সীমান্তে, প্রতিটি খালি থালায়, প্রতিটি তৃষ্ণায় কাঁদতে থাকা শিশুর চোখে।

জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর মতে: খাদ্য সংকট ধ্বংসাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। গাজার ৯০ শতাংশেরও বেশি শিশু পুষ্টিহীনতার শিকার। ক্ষুধা ও পানির ঘাটতিতে নবজাতকের মৃত্যু এখন প্রতিদিনের ঘটনা। তবুও, পৃথিবী নীরব! আরও ভয়াবহ হলো—কিছু সরকার ইসরাঈলের কর্মকাণ্ডকে 'আত্মরক্ষা' বলে বৈধতা দিচ্ছে। যেন ক্ষুধাকে অস্ত্র বানানো বৈধ! তবে দায় কেবল পশ্চিমাদের নয়। মিশরকেও তার ভূমিকার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। রাফাহ ক্রসিং, গাজার একমাত্র দরজা—যা সরাসরি ইসরাঈল নিয়ন্ত্রণ করে না—মাসের পর মাস বন্ধ। কায়রো, সহায়তা প্রবেশ করানো বা রোগী বের করতে অনুমতি চায় তেলআবিবের কাছে। আমরা আর কতদিন এটাকে 'নিরপেক্ষতা' বলে চালাবো? এ তো অপরাধে শরীক হওয়া! আর সেই আরব সরকারগুলো? যারা ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করেছে? কেউ চুপ থেকেছে, কেউ সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করেছে—অথচ গাজা ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে। অন্তত পশ্চিমারা গাজার সাথে আত্মীয়তার দাবি করে না। কিন্তু এরা তো করে—তবু কিছুই করে না ভাইদের দুঃখ লাঘবে। যেমন জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান সতর্ক করেছিলেন: "যখন খাদ্য অস্ত্রে পরিণত হয়, তখন মানবতা নিজেই ধ্বংস হয়।" গাজা আজ সেই ধ্বংসের মুখোমুখি—আর বিশ্ব ব্যবস্থা তাকিয়ে আছে। তবুও, সবকিছুর পরও গাজা অবিচল। গাজাবাসী ক্ষুধাকে প্রতিরোধে রূপ দিচ্ছে। তারা

লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, এমনকি যখন তাদের কাছ থেকে সব কেড়ে নেওয়া হয়েছে তখনও। গাজার মর্যাদা আরাম-আয়েশে নয়, বেঁচে থাকার সংগ্রামে। কিন্তু সত্যি ভেবে দেখুন— ইসরাঈল একা এটা চালিয়ে যেতে পারত না। এর শক্তি আসে এই নীরবতা থেকে, নিয়ন্ত্রিত ক্ষোভ থেকে, কূটনৈতিক আড়াল থেকে। আর এগুলোই দেয় সেই বিশ্বশক্তিগুলো, যারা মানবাধিকারের পতাকা তোলে কিন্তু নিজেদের মতো বেছে নেয়— কার যন্ত্রণা গুরুত্বপূর্ণ, আর কারটা নয়।

তাহলে প্রশ্ন হলো: আসলে গাজার পাশে কে দাঁড়াচ্ছে? কোনো সরকার নয়, কোনো প্রতিষ্ঠান নয়—বরং সাধারণ মানুষ। প্রতিবাদকারীরা, সাধারণ নাগরিকেরা। যারা এখনো বিবেক বাঁচিয়ে রেখেছে এবং চোখ ফিরিয়ে নিতে অসম্মত। গাজা কারও দয়ার ভিক্ষুক নয়—গাজা চায় ন্যায়বিচার। গণহত্যার অবসান চায়। আর যারা এই অপরাধে সহায়তাকারী, তাদের জবাবদিহি চায়। এখন প্রশ্ন আর 'কি ঘটছে?' নয়। আমরা ভালো করেই জানি কি ঘটছে। এখন প্রশ্ন হলো: 'কাজ করবে কে?' আর যখন ইতিহাস লেখা হবে, তখন কে শুধু নিজের নীরবতার কারণে পরিচিত হবে? কারণ ক্ষুধার মুখে নীরবতা মানে নিরপেক্ষতা নয়— এটি অপরাধে শরীক হওয়া!

[*এই প্রবন্ধ একটি সমকালীন অনলাইন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। ধার করা (চয়নকৃত) প্রবন্ধসমূহ সাময়িকীর সম্পাদকীয় নীতির আলোকে প্রকাশিত হয়।* —সম্পাদক]

# পাকিস্তানের লক্ষ্য... ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন

# লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর' নামে গড়া দেশের দারুল-আমানে নিগৃহীত জাতির কন্যারা

**—আরীব আতহার**

অ্যাবোটাবাদের একটি দারুল-আমানে বসবাসরত এক নারী প্রশাসনের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, এক নারীকে জোরপূর্বক কাবু করার চেষ্টা চলছে। এ সময় তাকে বলতে শোনা যায়— "এখানে আমার সঙ্গে অন্যায় হয়েছে, আমাকে নির্যাতন করা হয়েছে।"

পুলিশের উপস্থিতিতে যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, "আপনার সঙ্গে জোরজবরদস্তি করেছে কারা?"

তখন তিনি বলেন— "এরা-ই করেছে। এখানে অসৎ কাজ চলছে, আমার সাথেও অন্যায় হয়েছে।"

ওই ভিডিওতে দেখা যায়, মহিলা পুলিশ সদস্যরা তাকে টেনে হিঁচড়ে গাড়িতে তুলছে।

তবে এ দৃশ্য নতুন নয়। ২০১৮ সালে আরও একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে, যেখানে এক নারী হাতজোড় করে মানুষের কাছে মিনতি করছেন: "খোদার দোহাই, আমাকে এদের হাত থেকে বাঁচান, এরা আমাকে জোর করে খারাপ কাজে বাধ্য করছে।"

তার অনুনয়-বিনয়ের পরও ডেরা গাজি খানের দারুল-আমানের পুরুষ কর্মীরা ডজন ডজন মানুষের সামনে তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

পরে ২৬ জুন ২০২১ তারিখে ডন নিউজ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়— খাইবার পাখতুনখোয়ায় পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের সদস্য প্রাদেশিক পরিষদ মাদিহা নিসার অভিযোগ তোলেন যে, পেশোয়ারের ইয়াতীম শিশুদের জন্য গড়ে তোলা দারুল-আমান আসলে যৌন ও শারীরিক নিপীড়নের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। তার বক্তব্যে আরও উঠে আসে যে, দাতাদের দেওয়া সামগ্রী বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

মাদিহা নিসার দাবি জানান— দারুল-আমান নিয়ে সংসদীয় পর্যায়ে তদন্ত হওয়া উচিত। জবাবে প্রাদেশিক মন্ত্রী ড. আমজাদ বলেন, "শুধু একটি নয়, গোটা প্রদেশের সব দারুল-আমানেরই তদন্ত হওয়া জরুরি।"

## কাশানা কেলেঙ্কারি ও দারুল-আমানের বাস্তব চিত্র

কাশানা কেলেঙ্কারি সম্পর্কে প্রায় সবাই অবগত। এই ঘটনায় দারুল-আমানের সুপারিনটেনডেন্ট আফশান লতীফ যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন, তিনি ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের এক মন্ত্রী। পরবর্তীতে পিটিআই সরকারের পতনের পর সেই একই ব্যক্তি প্রথমে ইস্তেহকাম পাকিস্তান পার্টি এবং পরে নওয়াজ লীগে (ন-লীগে) যোগ দেন।

দারুল-আমানে সংঘটিত নিপীড়নের প্রেক্ষাপটে এই কেলেঙ্কারি সামাজিক মাধ্যমে বিপুল আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। সেই আলোচনার গুরুত্ব

অনুযায়ী এ বিষয়ে আদালতের কার্যক্রম শুরু হওয়া উচিত ছিল অথবা একটি কমিশন গঠিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাস্তবে মনে হয়, কোনো অদৃশ্য শক্তি এটিকে কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছে; আসল সমস্যা এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার বিষয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই।

## দারুল-আমান সম্পর্কিত আদালতের রায়

গত বছরের ডিসেম্বর মাসে লাহোর হাইকোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে পাঞ্জাবের সব দারুল-আমান থেকে পুরুষ কর্মচারীদের সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আদালত সরকারকে আরও নির্দেশ দেয় যে, শেল্টার হোমগুলো পর্যবেক্ষণের জন্য ডেটাবেস ও সফটওয়্যার তৈরি করতে হবে এবং সব দারুল-আমানের প্রবেশপথ ও চত্বর সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনতে হবে।

মানবাধিকার কমিশন অব পাকিস্তানসহ একাধিক সংস্থা আবেদন করেছিল, যেখানে বলা হয়েছিল— দারুল-আমানে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই, নারীর অধিকার রক্ষা করা হয় না এবং শিশু-সুরক্ষা আইন যথাযথভাবে কার্যকর হয় না।

জাস্টিস তারিক সলিম শেখ ৩৬ পৃষ্ঠার লিখিত রায়ে নির্দেশ দেন:

- শিশু সুরক্ষা ব্যুরোকে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিধি-নিষেধ প্রণয়ন করতে হবে।
- এসব প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নিশ্চিত করতে হবে।

- উপজেলা ও জেলা পর্যায় থেকেও পুরুষ কর্মচারীদের সরাতে হবে।
- শিশু সুরক্ষা ইউনিট গঠন করতে হবে।
- দারুল-আমান ও শেল্টার হোম সম্পর্কিত সব তথ্য সরকারি ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করতে হবে।

## পাকিস্তানে দারুল-আমান ও শেল্টার হোমের সংখ্যা

পাঞ্জাব প্রদেশে দারুল-আমানের নেটওয়ার্ক তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সংগঠিত। পাঞ্জাবের সমাজকল্যাণ ও বেতনভাতা বিভাগ (সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বায়তুল-মাল) এর অধীনে প্রদেশের বড় বড় শহর ও বহু জেলায় দারুল-আমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন— লাহোর, ফয়সালাবাদ, মুলতান, রাওয়ালপিন্ডি, বহাওয়ালপুরসহ আরও অনেক জেলায় দারুল-আমান রয়েছে। তবে দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত কিছু অঞ্চলে এ ধরনের সুবিধা সীমিত অথবা অকার্যকর অবস্থায় আছে।

একটি প্রতিবেদনের তথ্য মতে, কেবল পাঞ্জাবেই বর্তমানে ৩৬টি সক্রিয় দারুল-আমান রয়েছে।

সিন্ধ প্রদেশে করাচি, হায়দরাবাদ, সুক্কুর ও লারকানা—এ ধরনের বড় শহরে দারুল-আমান রয়েছে। নারীর সুরক্ষার জন্য সিন্ধ সরকার 'উইমেন প্রোটেকশন সেলস' এবং দারুল-আমানকে উন্নয়ন ও প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে গ্রামীণ অঞ্চলে এর সংখ্যা সীমিত।

খাইবার পাখতুনখোয়ায় পেশোয়ার, মারদান, অ্যাবোটাবাদ ও সোয়াতের মতো জেলায় দারুল-আমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৭ সালে কেপি সরকার

‘উইমেন এমার্জেন্সি শেল্টার’ চালুর ঘোষণা দেয়, কিন্তু জেলা পর্যায়ে এ সুবিধা সীমিত রয়ে গেছে।

বেলুচিস্তানে দারুল-আমানের সুবিধা মূলত কোয়েটা, গোওয়াদর ও তুরবতের মতো শহরগুলোতেই সীমাবদ্ধ।

## দারুল-আমানে কাদের রাখা হয়?

- যেসব নারী স্বামী, শ্বশুর বাড়ি বা অন্যান্য আত্মীয়ের কাছ থেকে শারীরিক, মানসিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হন। ২০০৯ সালের গৃহ-নির্যাতন (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন অনুসারে তাদের আইনি সুরক্ষা ও আশ্রয় দেওয়া হয়।
- যেসব নারী জোরপূর্বক বিয়ে বা ‘ইজ্জতের নামে হত্যার’ (যেমন—সিয়াহ কারি[55], কারোকারি[56]) হুমকির মুখে পড়েন।
- ধর্ষণ বা যৌন হয়রানির শিকার নারীদের জন্য আশ্রয়, আইনি সহায়তা ও মানসিক পুনর্বাসনের সুযোগ থাকে।
- যেসব মেয়েরা বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করে এবং পরে পরিবারের পক্ষ থেকে অপহরণের মামলা দায়ের করা হয়, আদালত তাদের দারুল-আমানে পাঠিয়ে দেয়।

---

[55] এই শব্দটি স্থানীয় রীতিতে এমন নারীর জন্য ব্যবহৃত হয় যাকে পরকীয়া, ব্যভিচার বা পরিবারের ‘ইজ্জত নষ্ট’ করার অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগ প্রমাণ হোক বা না হোক, তাকে ‘সিয়াহ কারি’ আখ্যা দিয়ে হত্যা পর্যন্ত করা হয়। - অনুবাদক

[56] কথিত ব্যভিচার বা অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে যে পুরুষ ও নারীকে অভিযুক্ত করা হয়, তাদের বোঝাতে এই যৌথ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। - অনুবাদক

- যেসব নারীর কোনো পারিবারিক আশ্রয় বা বসবাসের জায়গা নেই। ইয়াতীম শিশু, অথবা যাদেরকে পরিবার ত্যাগ করেছে। তবে বাস্তবে এ নিয়ম তখনই কার্যকর হয়, যখন কোনো ঘটনা মিডিয়ায় প্রকাশ পায় এবং সরকার বাধ্য হয় ওই শিশুদের দারুল-আমানে পাঠাতে।
- যেসব শিশু বা কিশোর-কিশোরী বাড়ি, স্কুল বা অন্য কোথাও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। যেমন— কাসুর কেলেঙ্কারি (২০০৬-২০১৪)-এর ভুক্তভোগীদেরও দারুল-আমান বা অনুরূপ আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদালতের নির্দেশে নারী ও শিশুদের দারুল-আমানে পাঠানো হয়। কিছু দারুল-আমান বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করে। যেমন— ভাক্কার জেলার গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট ফর স্লো লার্নার্স—এর সঙ্গে মিলে প্রতিবন্ধী শিশুদের সুবিধা দেওয়া হয়।

## আশ্রয়ের শর্তাবলি

বয়সসীমা: সাধারণত ১৮ থেকে ৬০ বছরের নারীদের রাখা হয়, তবে কিছু প্রতিষ্ঠানে বয়সের শর্ত শিথিল।

আইনি প্রয়োজনীয়তা: দারুল-আমানে প্রবেশের জন্য পুলিশ রিপোর্ট, আদালতের আদেশ অথবা সমাজকল্যাণ দপ্তরের সুপারিশ লাগে।

অবস্থানকাল: অস্থায়ীভাবে (কয়েক দিন থেকে কয়েক মাস) বা দীর্ঘমেয়াদি সময়ের জন্য রাখা হয়— মামলার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। কেউ কেউ

সেখানে থাকেন যতদিন না তাদের পুনর্বাসন (যেমন চাকরি বা পুনরায় বিয়ে) হয়।

প্রাদেশিক সরকার, সমাজকল্যাণ বিভাগ ও ডেপুটি কমিশনার প্রায়ই বড় বড় প্রতিনিধি দল নিয়ে এসব জায়গা পরিদর্শনে যান। অনেক সময় আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান হয়, যেখানে আশ্রয়কেন্দ্রের মেয়েদের সামনে আনা হয়।

## সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক

সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো— নতুন মুসলিম (নওমুসলিম) নারীরা, যারা খ্রিস্টান বা অন্য ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রায়ই তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ ওঠে যে, তাদের বয়স কম অথবা জোর করে ইসলাম গ্রহণ করানো হয়েছে। আদালত তখন তাদেরও দারুল-আমানে পাঠিয়ে দেয়।

আপনি একবার ভাবুন— যে মেয়ে বা নারী নিজের আত্মীয়স্বজন, গোত্র ও পরিবারের বৈরিতা সহ্য করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তিনি যদি ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের দারুল-আমানে এসে দেখেন যে, এখানে তার ইজ্জতও নিরাপদ নয়, তাহলে তার অবস্থা কী হবে? এর জন্য দায়ী কে হবে? এটাই নওমুসলিমদের একমাত্র কষ্ট নয়। আব্দুল ওয়ারিস গিল, যিনি খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, অত্যন্ত বেদনাভরা কণ্ঠে বলেন— নওমুসলিমরা শুধু আত্মীয় স্বজনের জুলুম-অত্যাচারেই ভোগেন না, বরং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও বৈষম্যের শিকার হন। নথিপত্র, সম্পত্তি,

জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট—এসব ক্ষেত্রেই তারা ভোগান্তির শিকার হন। তাদের মনে হয়, যেন তারা কোনো অপরাধ করে বসেছেন।

তাহলে প্রশ্ন হলো— দেশে ছড়িয়ে থাকা এসব দারুল-আমানের বিরুদ্ধে এমন ভয়ঙ্কর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো কেন নিশ্চুপ থাকে?

আমি আমার এক আত্মীয়কে জিজ্ঞেস করেছিলাম— তিনি একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের অধীনস্থ এক দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। প্রশ্ন করেছিলাম: "আপনাদের তো এসব প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার রয়েছে, তাহলে এ অনাচার ঠেকাতে আপনারা উদ্যোগ নেন না কেন?"

তার উত্তর বিস্ময়কর এবং বেদনাদায়ক ছিল। তিনি বললেন—

"আমাদের ধর্মীয় সংগঠনকে যেসব জায়গায় কাজের অনুমতি দেওয়া হয়, সেটা আসলে এই ব্যবস্থার অনুগ্রহ মাত্র। কোন জায়গায় আমাদের প্রবেশাধিকার থাকবে, সেটা এই ব্যবস্থা ঠিক করে। যেখানে তাদের অপরাধ প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা আছে, সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার তারা দেবে কেন? সরকারের বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা জিনিসপত্রও আত্মসাৎ হয়ে যায়, তারপর ধর্মীয় দাতব্য সংগঠনগুলোকে সামনের সারিতে এনে বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেগুলোও আত্মসাৎ হয়।

উদাহরণস্বরূপ, জেলখানায় ধর্মীয় দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে ওষুধ ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অথচ এসব ওষুধ সরবরাহ করার দায়িত্ব আসলে কারাগার কর্তৃপক্ষের। তারা আত্মসাৎ করে, তারপর দাতব্য সংস্থার মাধ্যমে যে ওষুধ দেওয়া হয়, সেটার বড় অংশও আত্মসাৎ হয়। একইভাবে, অপরাধীদের জরিমানা বা দণ্ড মওকুফের জন্যও দাতব্য সংস্থাগুলোকে

অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু মজার বিষয় হলো— যদি কারো অপরাধ হয় 'ইসলামপন্থা', 'জিহাদ' বা কোনো জিহাদি সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, তবে সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করার অধিকার এসব সংগঠনের নেই।"

আমি সুযোগ নিয়ে আরেকটি প্রশ্ন করি—আপনারা কি বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে আপনার দলের কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্ট? তিনি দীর্ঘ নীরবতার পর বলেন:

"মনে হয়, এই সিস্টেম আমাদের শক্তি ও সময় এমন কাজে খরচ করাচ্ছে যে আমাদের আর অবকাশ নেই নিজের কর্মীদের চরিত্রগঠন, আকীদার দৃঢ়তা, কিংবা দেশ-বিদেশের বাস্তবতা বোঝা ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার। যা একসময় আমাদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল, আজ কখনো 'সফট ইমেজ' দেখানোর জন্য, কখনো ভোটের জন্য—গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে। আমাদের মানদণ্ড পাল্টে যাচ্ছে। আগে আমরা মানুষকে বলতাম—আমাদের প্রার্থী বড় আলেম, আর প্রতিপক্ষ কেবল জমিদার; এখন সেই প্রার্থীরাই আমাদের দলে স্থান পাচ্ছে। এত কিছু করেও মনে হয়, আমরা এ ব্যবস্থার ভেতর কোনো অগ্রগতি অর্জন করতে পারিনি। জনগণের ও সিস্টেমের সংস্কারের কাজ থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি, আর এই সিস্টেমই আমাদের বদলে দিচ্ছে। এ সত্যিই দুঃখজনক।"

# ওঠো হে পাকিস্তান! ডাকছে তোমার মেয়ে

**—ফাওজিয়া সিদ্দিকী**

আরও একবার আমাদের জাতি নৈতিকতার এক বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আমাদের জাতির কন্যা, ডা. আফিয়া সিদ্দিকীর পক্ষে একটি 'অ্যামিকাস ব্রিফ'[57]-এ স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। অথচ এটি ছিল এক সরল আইনি পদক্ষেপ, যা আমার বোন ডা. আফিয়ার ন্যায়বিচার পাওয়ার সংগ্রামে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারত। আফিয়ার প্রতি প্রকাশ্যে বারবার সংহতি প্রকাশ করার পরও এই অস্বীকৃতিকে কেবল প্রশাসনিক গাফিলতি বলা চলে না; এটা এক গুরুতর নৈতিক ব্যর্থতা। বহু বছর ধরে আমরা সংসদ সদস্য, মন্ত্রী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের আবেগময় বক্তৃতা শুনেছি—যাঁরা গর্বভরে আফিয়াকে 'জাতির কন্যা' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যখন বাস্তবে একটি পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এলো; শুধু একটি আইনি নথিতে স্বাক্ষর করে তার পক্ষে আওয়াজ তোলার, তখন

[57] এমিকাস কিউরিয়াই ব্রিফ (Amicus Curiae Brief) হলো একটি আইনি নথি, যা তৃতীয় পক্ষের পক্ষ থেকে আদালতে দাখিল করা হয়। এই তৃতীয় পক্ষ মামলার বাদী বা বিবাদী—কোনোটিই নয়; তবে সে মামলায় আগ্রহী, কিংবা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদালতের সামনে উপস্থাপন করতে চায়। এমিকাস ব্রিফের মূল উদ্দেশ্য হলো আদালতকে অতিরিক্ত তথ্য, আইনি যুক্তি বা জনস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে অবহিত করা—যা মামলার রায় প্রদানে সহায়ক হতে পারে। সাধারণত এটি তখনই দাখিল করা হয়, যখন মামলার রায় সমাজে বা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। —সম্পাদক

সবাই নীরব হয়ে গেল। আমি স্পষ্ট করে বলছি: এই নীরবতা কোনো নিরপেক্ষতা নয়, বরং অপরাধে সরাসরি অংশগ্রহণ।

আরব ও দক্ষিণ এশীয় ঐতিহ্যে বলা হয়, 'এক জাতির সম্মান নিহিত থাকে তার নারীদের মর্যাদায়।' প্রতিটি সংস্কৃতি, প্রতিটি ধর্ম, প্রতিটি যুগে নারী কেবল নিজের পরিচয়ের প্রতিনিধিত্ব করেননি, বরং তাঁর পরিবার, তাঁর জাতি এবং তাঁর সভ্যতারও প্রতীক হয়েছেন। তাহলে যদি আমাদের কন্যারা অপহৃত হয়, নির্যাতনের শিকার হয়, বিদেশি কারাগারে দিন কাটায়, আর আমরা কিছুই না করি, তাহলে জাতি হিসেবে আমরা কোন নৈতিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছি? সম্প্রতি ইসলামাবাদ হাইকোর্ট সরকারের উদ্দেশে সতর্ক বার্তা দিয়ে বলেছে যে, তাদের নিষ্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা না দিলে আদালত অবমাননার অভিযোগ গঠন করা হবে। এই রায় কেবল আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যর্থতাই নয়, বরং এক বেদনাদায়ক বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করছে। আমাদের আদালত ন্যায়বিচার খুঁজছে, অথচ আমাদের শাসকরা ভয় ও টালবাহানায় বন্দী। এমনকি আজ বিদেশি আদালতও আমাদের প্রতিনিধিদের জবাবদিহি করতে বাধ্য করছে, কারণ আমরা নিজেরা তাদের কোনোদিন জবাবদিহির মুখোমুখি করিনি। এটা শুধু আইনি ব্যর্থতা নয়; এটা আমাদের জাতীয় চরিত্রের উপর এক কলঙ্ক। এটি প্রকাশ করছে সেই গভীর ক্ষত, যেখানে আমলাতন্ত্র মানবতার চেয়ে দাপ্তরিক কাগজপত্রকে বড় করে দেখে, আর রাজনৈতিক শ্রেণি একজন নিরপরাধ পাকিস্তানি নারীর প্রতিরক্ষাকে নিজের দায়িত্ব নয়, বরং বোঝা মনে করে। অথচ আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নারী ঘর, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সম্মানের প্রতীক। যখন তার মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়, যখন তাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা

হয়, অপমানিত করা হয় এবং নির্বাসনে পাঠানো হয়, তখন তার বেদনা আমাদের সবার জন্য এক যৌথ লজ্জায় পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই কোনো নারীর সম্মান আঘাতপ্রাপ্ত হলে নীরব থাকেননি। তিনি বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে তার নারীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।" যদি এটাই আমাদের মানদণ্ড হয়, তবে আমাদের চরিত্র কোথায় পৌঁছেছে? যে জাতি তার নারীদের অপমানিত হতে দেয়, পাচার হতে দেয়, অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখে, সে জাতি কেবল রাজনৈতিকভাবে নয়, নৈতিকভাবেও ধ্বংস হয়। আমি মনে করি, সময় এসেছে পাকিস্তানের সত্যিকার অর্থে জেগে ওঠার। অন্তঃসারশূন্য স্লোগান বা জনসভায় পতাকা নাড়িয়ে নয়; বরং সাহসিকতা ও কর্মের মধ্য দিয়ে, সবুজ-সাদা পতাকার শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে হবে। লাল, সাদা বা নীল কোনো বিদেশি পতাকার চাপে শরতের পাতার মতো ঝরে পড়লে চলবে না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়— সাম্রাজ্যগুলো কেবল বাইরের আক্রমণে ধ্বংস হয়নি; নৈতিক পতন ঘটলে তাদের সাহস নিভে গেছে, আর তারা নিজেরাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে।

আফিয়ার মামলা এক আয়না। এটি আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে আমরা আসলে কারা এবং কোন পথে এগোচ্ছি। আমরা কি আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারি, যখন আমরা নিজের কন্যাদের প্রতিই দয়া দেখাই না? আমরা কি বিশ্বসমাজে সম্মান আশা করতে পারি, যখন নিজেদের কন্যাদের বিদেশি কারাগারে ভুলে যাই? প্রতিটি দিন, যা ডা. আফিয়া সিদ্দিকী কোনো বিদেশি কারাগারে কাটান, আর তাঁর জাতি নীরব থাকে— সেটি কেবল জাতির নয়, আমাদের প্রতিটি দাবিকৃত নীতির অপমান। এখনই কিছু করতে হবে—এটি আমাদের কর্তব্যও বটে, আর আফিয়ার ঋণও। অথচ

এই অবস্থায় কিছু করতে অস্বীকৃতি জানানো, যখন আইনগত ও কূটনৈতিক পথ খোলা রয়েছে, এটি সাহস নয়, কাপুরুষতা। এটি আফিয়ার উপর নির্যাতনে অংশগ্রহণ, আমাদের জাতীয় মর্যাদার পতনে অংশীদার হওয়া এবং একটি পরিবারের দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ভেঙে যাওয়া হৃদয়ে আরেকটি আঘাত। আমি ক্ষমতাবানদের উদ্দেশে বলি: যদি আপনাদের ন্যায়ের পাশে দাঁড়ানোর সাহস না থাকে, তবে অন্তত তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না, যাদের অন্তরে এখনো চেষ্টা করার আবেগ বেঁচে আছে। মনে রাখবেন, ইতিহাস দেখছে, আদালত দেখছে। সর্বোপরি, পাকিস্তানের জনগণ দেখছে। ইতিহাস আপনাদের বক্তব্য মনে রাখবে না, কিন্তু আপনাদের নীরবতা মনে রাখবে। ইতিহাস প্রশ্ন তুলবে: যখন এক বোন সাহায্যের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল, তার রক্ষাকর্তারা কোথায় ছিল? আমি বারবার বলেছি: যখন এক নারীর মর্যাদা লঙ্ঘিত হয় আর তার জাতি নীরব থাকে, তখন সেই লজ্জা নারীর নয়; পুরো জাতির। আমাদের এখনই জেগে উঠতে হবে। আগামীকাল নয়; আজই, যাতে আমরা আমাদের কন্যা, বোন ও মায়েদের ফিরিয়ে আনতে পারি। কারণ যদি আমরা তাদের হারাই, তাহলে আমরা শুধু তাদের হারাব না; আমরা নিজেদেরও হারাব।

*[এই প্রবন্ধটি একটি সমসাময়িক দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ডা. ফাওজিয়া সিদ্দিকীর সকল মতামতের সাথে সম্পাদকমণ্ডলীর একমত হওয়া আবশ্যক নয়। - সম্পাদক]*

# সামরিক অভিজাতদের জায়নবাদী চরিত্র: পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গাজার পক্ষে দাঁড়ায় না কেন?

**— জুনাইদ আহমদ**

তারা বুকে পদক ঝুলিয়ে, পেছনে ক্ষেপণাস্ত্রের দৃশ্যকে সাজসজ্জা করে গর্ব ভরে হাঁটে। নিজেদের বলে— মুসলিম বিশ্বের রক্ষক, দ্বীনের প্রহরী, জাতির পাহারাদার। তাদের হাতে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সেনাবাহিনী রয়েছে, পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার রয়েছে, আর তারা এমন একটি রাষ্ট্রের শাসনভার নিয়েছে— যেটি নাকি নিপীড়িতদের আশ্রয়স্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু যখন গাজা কবরস্থানে পরিণত হয়, যখন ফিলিস্তিনি মায়েদের কোলে শান্তিতে ঘুমানো সন্তানের বদলে রক্তে ভেজা কাপড়ে মোড়া লাশ শুয়ে থাকে— তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কিছুই করে না। এমনকি তারা প্রচলিত 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশের আনুষ্ঠানিক বাক্যবন্ধের বাইরে যাওয়ারও কষ্ট করে না। কেন? এর উত্তর জটিল নয়। সেটি হলো দুর্নীতি! বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম সেনাবাহিনী, পারমাণবিক শক্তিধর, ২৪ কোটিরও বেশি মানুষের ওপর শাসনকারী— অথচ তারা ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে কোনো প্রতীকী পদক্ষেপ নিতেও অক্ষম! এর এক কথার উত্তর: জায়নবাদী চরিত্র। তবে সেটা জনগণের ধারণা মাফিক জায়নবাদ নয়; বরং সেই দাসসুলভ, মেরুদণ্ডহীন, বহিরাগত শক্তির প্রতি বশ্যতা স্বীকার করা

চরিত্র— যা পাকিস্তানের সামরিক ও রাজনৈতিক অভিজাতদের মস্তিষ্কে গেঁথে রয়েছে। এরা আসলে উম্মাহর রক্ষক নয়, বরং আমেরিকান স্বার্থের অনুগত প্রহরী— যারা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার দাসত্বে গলায় ভণ্ডামির মালা পরে আছে।

'কৌশলগত ধৈর্য' (strategic restraint) আর 'আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা' (regional stability)— এসব শোরগোলপূর্ণ স্লোগানের আড়ালে লুকিয়ে আছে নীরব অংশীদারিত্ব। পাকিস্তানি সামরিক এস্টাব্লিশমেন্ট, বিশেষত তার শীর্ষ নেতৃত্ব, বহু আগে থেকেই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী যন্ত্রের অংশে পরিণত হয়েছে। দশকের পর দশক পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের মার্কিন সামরিক একাডেমিগুলোতে পাঠানো হয়। শুধু যুদ্ধকৌশল শেখার জন্য নয়, বরং তাদের গড়ে তোলা হয় সাম্রাজ্যবাদী মূল্যবোধে— ওয়াশিংটনের প্রতি আনুগত্য, তেলআবিবের প্রতি বশ্যতা, আর পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রতিরোধের প্রতি ঘৃণা তাদের মধ্যে পুশ করা হয়।

তারপর তারা ঝকঝকে ডিপ্লোমা নিয়ে, স্ফীত অহংকার বুকে নিয়ে, গাজার আর্তনাদের প্রতি নির্বাক থেকে ফিরে আসে। আর পাকিস্তানের জনগণ— আল্লাহ তাদের অসীম ধৈর্য অটুট রাখুন— তাদেরকে বোঝানো হয় যে, এগুলো সবই 'আভ্যন্তরীণ বিষয়'। বিশ্বাস করানো হয় যে, সেনাপ্রধানের নিয়োগ হয় কেবল সিনিয়রিটি, স্থানীয় রাজনীতি বা কোনো 'ঐশী সিদ্ধান্তে'। কিন্তু বাস্তবতা উপনিবেশিক— প্রধান নির্বাচন হয় ইসলামাবাদে নয়, ওয়াশিংটনে।

যেসব জেনারেল নিজেদের দেশের সার্বভৌমত্বের রক্ষক বলে দাবি করে, তারা আসলে সাম্রাজ্যের ফ্র্যাঞ্চাইজি ম্যানেজার। তাদের প্রকৃত প্রভুরা

ইংরেজি ভাষায় আদেশ দেন এবং ফিলিস্তিনকে কেবল একটি ‘অপ্রয়োজনীয় সমস্যা’ মনে করেন।

উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান সেনাপ্রধান এবং ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের কথাই ধরুন। আজ্ঞাবহ মিডিয়া তাকে ‘হাফেজে কুরআন’ এবং ‘সেনাবাহিনীর নৈতিক কেন্দ্রীয় পুরুষ’ হিসেবে চিত্রিত করেছিল। কেউ আশা করতে পারে যে কুরআন মুখস্থ করা একজন ব্যক্তি গাজায় চলমান ইহুদীবাদী গণহত্যা সম্পর্কে কিছু তো বলবে। কিন্তু না! আসিম মুনিরের সাম্প্রতিকতম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পররাষ্ট্রনীতির ‘কৃতিত্ব’ হলো তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করেছেন।

হ্যাঁ! সেই ডোনাল্ড ট্রাম্প যিনি জেরুজালেমকে ইসরাঈলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, ‘শান্তির’ নামে বর্ণবাদী বৈষম্যকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং নেতানিয়াহুকে জুয়ার প্রতীক হিসেবে গোলান হাইটস দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের কুরআন মুখস্থকারী ফিল্ড মার্শাল তাকে শ্রদ্ধা জানান এবং ট্রাম্প আনন্দের সাথে ‘সম্মান’ গ্রহণ করেন। দৃশ্যটা ছিল ভয়াবহ—দুজন মানুষ একে অপরকে বাহবা দিচ্ছে, অথচ তাদের নৈতিক আদর্শ আসলে গণহত্যাকে উপেক্ষা করা। কিন্তু আসিম মুনির রোগের লক্ষণ মাত্র, রোগটি আসলে অনেক গভীর। পাকিস্তানি জেনারেলদের ইহুদীবাদ ইসরাঈলি স্টাইলের নয়, বরং এটি আরও ধূর্ত, আরও কাপুরুষোচিত এবং আরও লাভজনক। এটি নীরবতার ইহুদীবাদ। এটি গোপনে সম্পর্ক ‘স্বাভাবিক’ করার ইহুদীবাদ। এটি ফিলিস্তিনি ও নিপীড়িতদের জীবনের চেয়ে আইএমএফ ঋণ এবং পেন্টাগনের প্রশংসাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ইহুদীবাদ। যখন ফিলিস্তিনিদের উপর আমেরিকান ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে বোমাবর্ষণ করা হয়, তখন পাকিস্তানি জেনারেলরা ক্রোধে

জ্বলে ওঠেন না, বরং তারা তাদের বক্তব্যকে 'কূটনৈতিক ভারসাম্য'-এর ছাঁচে ঢেলে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

যদি এই জেনারেলরা কখনও গাজা সম্পর্কে কথা বলেন, তারাও পররাষ্ট্র দপ্তরের ঐতিহ্যবাহী, নির্জীব, মৃত ভাষায় কথা বলেন। কোনো ব্যথা নেই, কোনো আবেগ নেই, কোনো গর্ব নেই। ঠিক একই জীর্ণ লাইন: "পাকিস্তান তীব্র নিন্দা করে..." এবং তারপরে ওয়াশিংটনে সাহায্যের জন্য আরও অনুরোধ পাঠানো হয়। নিজেদের সাহসিকতা নিয়ে গর্বিত সেনাবাহিনীর এই নীরবতার পিছনে আসলে কাপুরুষতা লুকিয়ে আছে।

বিড়ম্বনা দেখুন। ভারত যখন নিয়ন্ত্রণ রেখায় 'হাঁচি' দেয়, তখন এই জেনারেলরা বলিউডের এক্সট্রা অভিনেতাদের মতো তাদের বুক ফুলিয়ে তোলে। ৪৮ ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ এবং পুরো জাতির সামনে এক দৃশ্যপট তৈরি করা হয়—যুদ্ধবিমান উড়ছে, মন্ত্রীরা পতাকা উড়িয়েছেন এবং আইএসপিআর জাতীয় সঙ্গীত প্রস্তুত করছে যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের বারবার বলা হচ্ছে যে এই লোকেরা 'জাতির গর্ব', তারা সর্বদা মুসলমানদের সম্মান রক্ষার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু যখন ইসরাঈলি ট্যাঙ্ক গাজায় প্রবেশ করে, হাসপাতালগুলিকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়, শরণার্থী শিবিরগুলিকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়? নীরবতা! কোনো বাস্তব পদক্ষেপের ফিসফিসানিও শোনা যায় না তখন।

এ এক ভয়ংকর দ্বিচারিতা। যখন ফিলিস্তিনের শিশুরা ধ্বংসস্তূপের নিচে মারা যাচ্ছে, তখন জাতির এই স্বঘোষিত অভিভাবকরা তাদের পদক প্রদর্শন করছেন এবং ট্রাম্পকে অভিনন্দন পত্র লিখছেন। পাকিস্তানে, জনগণ রাস্তায় বিক্ষোভ করছে, ফিলিস্তিনি পতাকা উড়িয়েছে এবং তাদের যা কিছু আছে তা দান করছে। কিন্তু তাদের শাসক, সামরিক অভিজাতরা,

তাদের সাম্রাজ্যবাদী উদাসীনতায় ডুবে আছে। পাকিস্তানে স্লোগানের অভাব নেই।'"কাশ্মীর পাকিস্তান হয়ে যাবে' স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, 'লাবাইক ইয়া আকসা' ব্যানার উত্তোলন করা হচ্ছে, কিন্তু এই সমস্ত নাটকীয় অভিব্যক্তি তাদের মুনাফেকির কাছে হেরে যায়। ফিলিস্তিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সযত্নে তৈরি পৌরাণিক চরিত্রের বাস্তবতা প্রমাণ করে, যা রূপকথার গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। ফিলিস্তিনের ইস্যু এমন এক শাসক শ্রেণির মুখোশ খুলে দেয়, যারা নিপীড়নবাদী ব্যবস্থায় গভীরভাবে আগ্রহী—এমন নিপীড়নবাদী সিস্টেম, যা পশ্চিমাদের পছন্দনীয় এবং ইহুদীবাদী ডিজাইনে তৈরি।

এখন এই প্রশ্ন উত্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ: গাজা সীমান্তে একটি প্রতীকী বাহিনী পাঠালে পাকিস্তানের কী এমন ক্ষতি হয়ে যাবে? সামরিক চিকিৎসা কর্মীদের একটি দল তারা কি পাঠাতে পারে না? মিশরে সাহায্য বহনকারী একটি কূটনৈতিক বহর? বা ইসরাঈলি অস্ত্রের অর্থায়নকারী কোম্পানিগুলোর একতরফা বয়কট? এই কাজগুলো কি তারা করতে পারে না? কিন্তু না; কিছুই করা হচ্ছে না। কেন? কারণ তাদের লক্ষ্য নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা নয় বরং 'স্থিতাবস্থা' বজায় রাখা। জেনারেলরা ভালো করেই জানেন যে গাজার পাশে দাঁড়ানোর অর্থ আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। আর এটা তাদের জন্য চিন্তা করাও অসম্ভব। তদাপেক্ষা একটি কুরআনের আয়াত টুইট করা, শুক্রবারের খুতবা দেওয়া এবং তারপর বাহরিয়া টাউনের পরবর্তী জমি সামরিকভাবে দখল করা অনেক ভালো। যখন ফিলিস্তিনি শিশুরা ধ্বংসস্তূপের নিচে নিঃশ্বাস হারায়, তখন এ 'উম্মাহর রক্ষকরা' মেডেল পালিশ করে আর ট্রাম্পকে অভিনন্দন চিঠি লেখে। পাকিস্তানে জনগণ রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করে, ফিলিস্তিনি পতাকা

ওড়ায়, যা সামান্য আছে তাই দান করে। কিন্তু শাসকরা, এই সামরিক অভিজাতরা, তাদের সাম্রাজ্যবাদী উদাসীনতায় নিমজ্জিতই থাকে।

তবে এর বাইরেও আরেকটি অন্ধকারতর দিক আছে: পাকিস্তানি অভিজাতরা হয়তো ইসরাঈলের মধ্যে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে। সামরিক অভিজাতরা দেশে ভিন্নমত দমন করে, নির্বাচন সাজায়, সাংবাদিকদের গুম করে। তারা হয়তো ইসরাঈলের 'সাফল্যে' মুগ্ধ— যা এমন এক ঔপনিবেশিক চৌকি, যা কেবল সামরিক শক্তির জোরে আঞ্চলিক পরাশক্তি হয়ে ওঠে। হিংসা করার মতো বিষয়ই তো! সম্ভবত এই কারণেই তারা নিজেদের অফিসারদের ইসরাঈল ঘেঁষা সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠায়, যাতে তারা অন্যায় মোকাবিলা নয়, বরং অন্যায় সংগঠিত করা শিখে আসে। এভাবেই নাটক চলতেই থাকে।

গাজা জ্বলছে, পাকিস্তানি জেনারেলরা পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সেলফি তুলছে, একজন 'হাফিজে কুরআন' যুদ্ধাপরাধীকে নোবেল শান্তির পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন দিচ্ছে। সামরিক বাজেট ফুলে ফেঁপে উঠছে, অথচ নৈতিক সাহস উধাও। সিস্টেম কার্যকর, কিন্তু কেবল তাদের নিজেদের জন্য।

কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ এর চেয়ে ভালো ভালো কিছুর হকদার। তারা ভীরু নয়, তারা বিশ্বাসঘাতক নয়। করাচি থেকে খাইবার পর্যন্ত মানুষ ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়িয়েছে—শুধু আদর্শিকভাবে নয়, বরং হৃদয়ভরা দুঃখের সাথে সংহতি জানিয়ে। তারা বোমাবর্ষণ দেখে শোকাহতদের সঙ্গে বিলাপ করে। তারা জানে, নীরবতা মানে সহযোগী হওয়া। অথচ তাদের শাসকরা গাজাকে কেবল 'মিডিয়ার ইস্যু' ভাবে, আর পেন্টাগনকে ভাবে বাবা-তুল্য প্রতিষ্ঠান। এই মানসিক বিভক্তি আর সহনীয় নয়। পাকিস্তানের

এখন আর প্রয়োজন নেই সামরিক কুচকাওয়াজ কিংবা টেলিভিশনে দেখানো বায়বীয় প্রদর্শনের। তার প্রয়োজন নৈতিক স্বচ্ছতা। প্রয়োজন এমন নেতৃত্বের, যারা 'গণহত্যা' আর 'জিও-স্ট্র্যাটেজির' মধ্যে পার্থক্য করতে জানবে। প্রয়োজন এমন জেনারেলের, যারা কুরআনের আয়াত পড়বে এবং তার উপর পূর্ণভাবে আমল করবে—শুধু বাছাইকৃত কুরআনের আয়াত নয়, কেবল দেখানোর জন্য নয়, বরং ন্যায়কে লক্ষ্য আর সাহসকে মাধ্যম বানিয়ে কুরআন বুকে নিয়ে এগিয়ে যাবে। সুস্পষ্ট কথা হলো—এক জাতি, যার সেনাবাহিনী গাজার প্রতি ভালোবাসার চেয়ে ওয়াশিংটনের প্রতি ভয়ে বেশি কাঁপে, তারা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেনি; বরং তারা তাদের আত্মাকে বন্ধক রেখেছে।

তাহলে মেডেলগুলোতে ধুলো জমুক, খুতবা বন্ধ হোক, জেনারেল আর তাদের স্তাবকরা রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে ভোজে মেতে থাকুক। ইতিহাস তাদের ভালো কথায় কখনো স্মরণ করবে না। যখন গাজার শিশুদের গণকবরে শুইয়ে রাখা হচ্ছে, পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শালকে ইতিহাস মনে রাখবে এক গণহত্যাকারীকে শান্তির পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা মানুষ হিসেবে।

যতদিন না পাকিস্তানের সামরিক অভিজাতরা তাদের ঔপনিবেশিক আনুগত্য ত্যাগ করছে, আর নির্যাতকের পরিবর্তে নিপীড়িতের পক্ষে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, ততদিন তাদের সব উচ্চপদবী—'চিফ অব আর্মি স্টাফ', 'ফিল্ড মার্শাল', 'স্ট্র্যাটেজিক কমান্ড'—সবই অর্থহীন। ওগুলো হবে ভীরুদের মেডেল।

আর জনগণ? তাদের উচিত হাততালি থামানো—শোকর আলহামদুলিল্লাহ—অধিকাংশই এখন থামিয়েছে। তাদের উচিত এ জেনারেলদের কিংবদন্তির নায়ক ভাবা বন্ধ করা, যারা গণহত্যার সামনে

মাথা নোয়ায়। ইউনিফর্মকে সম্মানের প্রতীক ভাবার ভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসা। কারণ আগামীবার যখন আরেকটি গাজা জ্বলবে—আর তা হবেই—তখন পাকিস্তানি ব্যারাক থেকে ভেসে আসা নীরবতা আবারও কোনো বোমার শব্দের চেয়েও প্রবলভাবে প্রতিধ্বনিত হবে। আর সেই নীরবতাই হয়ে উঠবে তাদের উত্তরাধিকার।

# কাশ্মীর...

# গাযওয়াতুল হিন্দের দরোজা

# তোমার নেতৃত্বের কাছে প্রশ্ন রাখো!

—মুহাম্মাদ তারিক ডার শোপিয়ানি

উঁচু উঁচু পর্বতমালার মাঝখানে অবস্থিত কাশ্মীর উপত্যকা—এ এক মহান ময়দান, যেখানে ১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রয়েছে।

আমরা সবাই ভালোভাবেই জানি, এই জিহাদ অবিরাম চলছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর দৃশ্যমান কোনো ফল আমরা পাইনি। বরং সময়ের সাথে সাথে কাফেরদের দখল আরও শক্ত হয়েছে, আর আমরা কেবল নির্বাক দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি। কাশ্মীরের জিহাদ নতুন কোনো আন্দোলন নয়। যদি ডোগর শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকেও ধরা হয়, তবে প্রায় ৯০ বছরের ইতিহাস এ সংগ্রামের। অথচ এত দীর্ঘ সাধনা ও ত্যাগের পরও আমরা বাস্তব কোনো অর্জন দেখতে পাচ্ছি না। যখনই আমি কাশ্মীরের জিহাদ নিয়ে ভাবি, তখনই রেহান খান ভাই রহিমাহুল্লাহ-এর সেই কথাগুলো মনে পড়ে যায়: "আমার সম্মানিত ভাইয়েরা! যেমন নামায একটি ইবাদত, রোযা রাখা একটি ইবাদত, যাকাত দেওয়া একটি ইবাদত এবং হজ আদায় করাও একটি ইবাদত—তেমনি জিহাদও একটি ইবাদত। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। যেমন নামায, রোযা, যাকাত ও হজের পদ্ধতি ও শর্তাবলী পরিষ্কার, তেমনি জিহাদেরও পদ্ধতি ও শর্তাবলী সুস্পষ্ট। যেমন নামাযের কিবলা নির্দিষ্ট, তেমনি জিহাদেরও একটি কিবলা রয়েছে। নামায যদি সঠিক কিবলামুখী

হয়ে আদায় হয়, তবে তা ইবাদত। কিন্তু যদি কিবলা ও পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়, তবে তা নামায নয়—বরং আল্লাহর সঙ্গে বিদ্রোহ। শরীয়তের আহ্বান মিথ্যা মানব রচিত ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করা এবং স্রষ্টার বিধানকে গ্রহণ করা। নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধানই মানবজাতির জন্য ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা, যেখানে মুসলমানদের জন্য রয়েছে সত্যের পথ। তাই, আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আমাদের জিহাদ সর্বদিক থেকে পরিষ্কার হতে হবে। এর কিবলা ও এর পথ সুস্পষ্ট হতে হবে।

হে আমার সম্মানিত মুজাহিদিন ভাই!

আমরা সবসময় তোমাদের জন্য দোয়া করি। আমরা তোমাদেরকে দ্বীনের পথে আমাদের আপন ভাই মনে করি। আমাদের অন্তরে তোমাদের প্রতি কোনো ক্ষোভ বা বিদ্বেষ নেই। তবে আমাদের অন্তর সবসময় একটি চিন্তা ও দুঃখে ভারাক্রান্ত থাকে—আমাদের ইবাদত যেন শুদ্ধ হয়, আমাদের জিহাদ যেন সঠিক হয় এবং বিশেষত আমাদের জিহাদ যেন নিরাপদ (জিহাদের সুফল যেন সংরক্ষিত) থাকে।”

রেহান খান ভাইয়ের এই বাণীতে তিনি জিহাদের আধ্যাত্মিক ও ঈমানি মর্যাদাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য হলো: জিহাদ নামায, রোযা, যাকাত ও হজের মতোই এক মহৎ ইবাদত—এবং আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম আমল।

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, জিহাদকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করতে হলে এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সর্বাংশে শরীয়ত নির্ভর এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

কোনো সংগ্রাম যদি তার 'কিবলা'—অর্থাৎ উদ্দেশ্য—বা তার 'পথ'—অর্থাৎ মৌলিক নীতি সমষ্টি—আল্লাহর নির্দেশিত সেই সঠিক দিক থেকে সরে যায়, যদি তা আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ের শাসন কায়েমের বদলে কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া বা রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের দিকে মোড় নেয়, তবে তা আর প্রকৃত জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হয় না, যেটিকে আল্লাহর ইবাদত বলা হয়। এ অবস্থায় সেই সংগ্রাম মূল শরঈ উদ্দেশ্য হারিয়ে শুধুই রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক লড়াইয়ে পরিণত হয়। আর তখন তার মর্যাদা আর 'আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম আমল' হিসেবে থাকে না।

তাই জিহাদের আসল রূহ (প্রাণ সত্তা) অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এর দিকনির্দেশ, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সর্বদা শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কাশ্মীরের জিহাদ বহু দূরদর্শী নেতা ও অসংখ্য নিঃস্বার্থ মুজাহিদ দেখেছে। গাজী বাবা, বুরহান ওয়ানি কিংবা জাকির মুসা রহমাতুল্লাহি আলাইহিম—তাঁদের সবার অন্তর একই আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ছিল। এখানে লড়াই করা প্রতিটি মুজাহিদই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ময়দানে নেমেছিল, সে যে সংগঠনেরই হোক না কেন। তাহলে প্রশ্ন হলো: আমরা এত অগণিত আত্মত্যাগ করার পরও আজ কেন কাফেরদের ফাঁদে আরও শক্তভাবে আবদ্ধ? কয়েক দশক ধরে চলা জিহাদের ফল আমরা কেন পাচ্ছি না? এত নিষ্ঠাবান মানুষের শাহাদাতের পরও আমরা কেন বিজয়ী হতে পারছি না? যে কেউ আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি রাখে, তার মনেও এই প্রশ্নগুলো জাগে। একদিকে তার দৃষ্টি পড়ে হিন্দু মুশরিকদের দিকে, আরেকদিকে সেই মুনাফিকের দিকে, যে ইসলামের আবরণে লুকিয়ে কপটতা করে। দুঃখের বিষয়, কিছু লোক নিজেদের স্বার্থের জন্য এই ভণ্ডামিকে সহ্য করেছে। আর কেউ যদি কখনো

এই মোনাফেকির কালো মুখ উন্মোচন করার চেষ্টা করেছে, তখনই তার ওপর দোষ চাপানো হয়েছে—তাকে 'শত্রুর এজেন্ট' বলা হয়েছে, তারপর তাকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে—কখনো বিষ প্রয়োগে, কখনো প্রতারণামূলক উপহার দিয়ে, কখনো বা তার তথ্য শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে। আজ কাশ্মীরের জিহাদ এক অত্যন্ত কঠিন, এমনকি ইতিহাসের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্ত পার করছে। এমন দুঃসময়ে যারা এ আহ্বানকে উঁচু করে ধরে রেখেছে— জিহাদের সেই মহান দাওয়াতি বীর পুরুষদের কাঁধে বিশেষ দায়িত্ব বর্তায়। তাদের দাওয়াত হতে হবে সম্পূর্ণ স্পষ্ট, নির্ভীক ও দ্ব্যর্থহীন। এই আহ্বান কেবল সেই আহ্বানই হবে, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজেই নির্ধারণ করেছেন—আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য। এটিকে কখনোই কোনো রাষ্ট্রের সাময়িক রাজনৈতিক স্বার্থ বা জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার অধীন করা যাবে না। এটিকে কারো হাতের খেলনা বানাতে দেওয়া চলবে না। এই জিহাদ শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। প্রকৃত জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ হয় না কোনো ভৌগোলিক দখলদারির জন্য, কোনো জাতীয়তাবাদের জন্য, কোনো ব্যক্তিগত খ্যাতি, প্রদর্শনী বা দুনিয়াবি সম্পদ অর্জনের জন্য। এটি হয়ে থাকে একান্তই আল্লাহর কালিমা উঁচু করার জন্য, তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— "কোনো ব্যক্তি যদি যুদ্ধ করে সম্পদ অর্জনের জন্য, কেউ যদি লড়ে খ্যাতির জন্য, আবার কেউ যদি যুদ্ধ করে লোক দেখানোর জন্য—তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে?" তখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন: "এদের কেউ নয়। আল্লাহর পথে কেবল সে-ই যুদ্ধ করছে, যে আল্লাহর কালিমা উঁচু করার জন্য লড়ছে।"

তাই আহ্বানদাতাদের মনে রাখা আবশ্যক: কাশ্মীরে আমাদের সব ত্যাগ-তিতিক্ষা কেবল আল্লাহর একত্ব ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই। আমাদের মহান নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন:

لا يلدغ المؤمن في جحر واحد مرتين

"একই গর্ত থেকে মুমিন দুবার দংশিত হয় না।" (সহীহ বুখারী: ৬১৩৩)

রাসূল ﷺ-এর এই বাণী আমাদের জন্য শিক্ষাও, পথনির্দেশও। আমাদের এই জিহাদ এখন এমন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা ও সুদূরদর্শিতার সাথে নিতে হবে। আমাদের কাজ শুধু হিন্দু মুশরিকদের দমন-নীতি প্রতিহত করাই নয়, বরং আরও বড় কাজ—এই 'উম্মুল ফরায়েয' অর্থাৎ আল্লাহর পথে জিহাদকে মুনাফিকদের নোংরা ফাঁদ থেকে রক্ষা করা। আমরা এই বিশ্বাসঘাতক ও বেঈমান মুনাফিকদের ভরসায় অনেক কিছু হারিয়েছি, এক ভয়াবহ মূল্য পরিশোধ করেছি। এরা যেখানেই তাদের পরিবর্তনশীল বৈদেশিক নীতি আর আঞ্চলিক আধিপত্যের নোংরা স্বার্থ লাভ দেখেছে, সেখানেই আমাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই যখন ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বে নিজেদের উপকার দেখেছে, নির্মমভাবে আমাদের সাপ্লাই লাইন কেটে দিয়েছে, আর আমাদের অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে গেছে। আমাদেরকে এমনভাবে পরিত্যাগ করেছে, যেন এক নিষ্পাপ শিশুকে তার মা-বাবা বাজারের ভিড়ের মধ্যে এ বলে ছেড়ে দিলো— "আমরা এখনই আসছি।" অথচ সে শিশু সেই ভিড় আর কোলাহলে কিছুই বুঝতে পারে না, হাবুডুবু খেতে থাকে, আর শেষে শিকারিদের হাতে পড়ে যায়।

এটা কোনো একক ঘটনা নয়—অসংখ্য হৃদয় বিদারক ঘটনার শৃঙ্খল। তারা আমাদের ভাইদের খবর শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে তাদের শহীদ করিয়েছে—শুধু এই অপরাধে যে, আমাদের ভাইয়েরা এই মুনাফিকদের আসল চেহারা উন্মোচন করতে চেয়েছিল, আর তাদের বিশ্বাসঘাতক অভিপ্রায়ের জবাবদিহি দাবি করার সাহস দেখিয়েছিল। এই মুনাফিকরাই নিজেদের সেনাবাহিনীর অহংকার আর মর্যাদা বাঁচাতে আকাশ নিয়ন্ত্রণে রাখে, অথচ কাশ্মীরি মুসলমানদের আসন্ন নিধনের দৃশ্যের সামনে নির্বিকার নীরবতা অবলম্বন করে? যে সেনা বা সরকার নিজেই শরীয়তের সঙ্গে বেয়াদবি করেছে, তাদের কাছ থেকে আমরা কী কল্যাণ আশা করতে পারি? এরাই তো 'গাযওয়াতুল হিন্দ' কে—যা এখন তাদের কাছে কেবল নিজের ভাবমূর্তি রক্ষা করার হাতিয়ার—ট্রাম্পের একটি ফোন কলেই বাতিল করে দেয়! এ কাজগুলো নিরেট মুনাফিকির ঘৃণ্যতম নিদর্শন, যা তাদের উচ্চকণ্ঠ দাবির বাস্তবতা ফাঁস করে দেয়।

যদি বাবরি মসজিদ ভাঙার অপরাধী দোষী হয়, তবে লাল মসজিদ ধ্বংসের নকশাকারদের বিচার কী হবে? 'অপারেশন সাইলেন্স'-এর পরিকল্পনাকারীদের জন্য কী হুকুম হবে? যে সেনারা ওয়াজিরিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম এলাকাকে বোমায় ঝাঁঝরা করেছে, তাদের শাস্তি কী হবে? যারা আমেরিকানদের নিজেদের বিমানঘাঁটি ব্যবহার করতে দিয়েছে—যা মুসলমানদের বিরুদ্ধেই কাজে লাগানো হয়েছে—তাদের ব্যাপারে কী রায় হবে?

আর সেই সব লোক, যারা জাতির কন্যা ড. আফিয়া সিদ্দিকীকে বিক্রি করেছে, যারা হাজারো মুসলমানকে আমেরিকার হাতে বেচে দিয়েছে—যাদের অনেকেই আজও বন্দীশালায়—তাদের জন্য কী ফতোয়া? তবে এর

মানে মোটেই এই নয় যে আমরা পাকিস্তান থেকে আসা আমাদের মুহাজির ভাইদের বিরুদ্ধে মন্দ কথা বলব।

সম্মানিত মুহাজির ভাইরা!

আমি আপনাদের মহত্ত্ব আর আত্মত্যাগের ধুলো সমানও নই। আমার ভেতরে এতটা প্রজ্ঞা বা সাহস নেই যে আপনাদের কোনো ত্রুটি ধরিয়ে দিতে পারি বা সংশোধনের শিক্ষা দিতে পারি। আমরা অবশ্যই আপনাদের কাছে ঋণী। আপনারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে এই জিহাদকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আপনাদের মায়েরা-বোনেরা তাদের অমূল্য সম্পদও কুরবান করেছেন, যাতে এ শিখা নিবে না যায়। আপনারাই এ পথে আমাদের নেতা ও শিক্ষক। আপনাদের উপস্থিতিতেই এ জিহাদের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে। আপনারাই এ জিহাদের পুনর্জাগরণের কাণ্ডারী। সেই সত্তার কসম, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন—আমার হৃদয় আপনাদের ভালোবাসা ও সম্মানে পূর্ণ। আমি আপনাদের দিকনির্দেশনা ও কৃপা প্রত্যাশী। আজ আমরা সকলে কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত। আপনাদের কাঁধে এক ভীষণ ভারী দায়িত্ব বর্তায়। এর মানে এই নয় যে আপনারা আপনাদের জামাত থেকে সরে যাবেন। বরং আসল গুরুত্ব এ জায়গায় যে, আপনাদের বুকের ভেতরে স্বাধীন জিহাদের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে, আর সেটি অন্যদের হৃদয়েও পৌঁছে দিতে হবে। মুনাফিকদের নোংরা ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষার জন্য আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। আবু দুজানা ও মুফতী ওয়াকাসের মতো মহৎ মুজাহিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। আমাদের অশ্রুভরা চোখ আপনাদের প্রতীক্ষায়, হৃদয় আপনাদের সাক্ষাতের জন্য অস্থির। আমরা আপনাদের আগমনের অপেক্ষায় আছি—তবে সেই অবস্থায়, যখন আপনারা ওই গোপন সংস্থাগুলির শিকল থেকে

মুক্ত হবেন, যারা আমাদেরকে ও আপনাদেরকে বিদেশিদের কাছে বিক্রি করেছে।

স্থানীয় মুজাহিদ ভাইদের প্রতি নিবেদন

আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ, ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি, তা মনে রাখুন। কী পেয়েছি আর কী হারিয়েছি, তা আত্মজিজ্ঞাসা করুন। নিজেদের কাতারকে পুনর্গঠিত করুন। আর সেই বিশ্বাসঘাতকদের ফাঁদে পড়া থেকে বেঁচে থাকুন, যারা নিজের স্বার্থে আপনাদের বিক্রি করে দেয়। নিজেদের কাছে প্রশ্ন রাখুন— উস্তাদুল মুজাহিদীন শহীদ আদিল মীর, যিনি গাজী সরফরাজ নামেও পরিচিত, কেন তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল যখন তিনি সীমান্তের ওপারে বসে থাকা এজেন্টদের সাথে যোগসাজশকারী একজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর তথ্যদাতার যোগাযোগ প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন? শহীদ বুরহান ওয়ানিকে সেই স্যাটেলাইট ফোন উপহার দিল কে—যখন সবাই জানত এর মাধ্যমে তাদের অবস্থান বের করে ফেলা সম্ভব? আমীর শহীদ জাকির মুসার কাফেলার ওপর এত গুরুতর অভিযোগ কেন চাপানো হলো? কেন তাকে বিশ্বাসঘাতক ও শত্রু এজেন্ট উপাধি দেওয়া হলো? নিশ্চয়ই আপনাদের হৃদয় এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবে।

তুমি ঘুরপাকের কথা ছাড়ো,
বলো—কাফেলা কেন লুট হলো?
আমি দস্যুদের দোষ দিই না,
প্রশ্ন তোমারই নেতৃত্বের!

হৃদয় শোকে ভারাক্রান্ত, চোখ অশ্রুসজল। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি—এই লেখার ভেতরের কল্যাণ যেন আপনাদের অন্তরে প্রবেশ করে। আর যদি কোনো ভুল আমার কলমে চলে এসে থাকে, আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমি যখন এ উপত্যকার করুণ চেহারা দেখি, আমার বুক যন্ত্রণায় ভরে ওঠে, হৃদয় থেকে রক্তবিন্দু ঝরে পড়ে। আমি শহীদ ও বন্দীদের কুরবানী স্মরণ করি, তাদের পরিবারগুলির দুর্দশা মনে পড়ে যায়। আমি আপনাদের কাছে আকুল অনুরোধ করি—তাদের পরিবারগুলোকে সাহায্য করুন। তারা বিপদে আছে, যতটুকু পারেন, তাদের পাশে দাঁড়ান। এই গুনাহগারকে আপনাদের দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। কিছু কথা বুকে জমে রইল, বাকিটা অন্য সময়।

# পুরো হিন্দ আমাদের

# বাহ্যিক যুদ্ধের অন্তর্নিহিত কৌশল | দ্বিতীয় কিস্তি

*ভারতে ক্রমবর্ধমান নাস্তিকতা ও শিরকের প্রেক্ষাপটে এক চিন্তার আহ্বান*

**—মাওলানা ইবনে উমর ইমরানি গুজরাটি**

পূর্ববর্তী কিস্তিতে একটি ভূমিকা-ধর্মী আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছিল। তবে সেটি ছিল যথেষ্ট সীমিত ও দায়সারা গোছের। কারণ পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা নয়, বরং কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই সংক্ষিপ্তভাবে সে বিষয়গুলো উল্লেখ করাই যথাযথ মনে করা হয়েছিল।

আসল উদ্দেশ্য হলো চিন্তার গঠনমূলক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত কৌশল—তার অজানা বাস্তবতা, নাস্তিকতা লালনে এর রূপান্তর এবং দাজ্জালের সেনাদল তৈরিতে এর ভূমিকা ও নানা দিক উন্মোচন করা। এই কিস্তি থেকেই তার সূচনা হচ্ছে।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের মূলত দুটি মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত অস্ত্র রয়েছে—

১. আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা (Modern Education System)

২. আধুনিক প্রচার মাধ্যম (Modern Media Platforms)

## আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা (Modern Education System)

## ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব ধাঁচের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। যার আসল ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা এবং ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে পরিচয়— যুক্তিবিজ্ঞান ও সমসাময়িক বিদ্যাও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র ছিল মাদারিসে আরাবিয়া ও মাদারিসে আসরিয়া, যেখানে মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পরিশুদ্ধতার সুষম বিকাশের দিকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। হিন্দুদের নিজস্ব বিদ্যালয় ছিল, যেগুলোকে বলা হতো 'গুরুকুল'; খ্রিস্টানদের ছিল তাদের 'চার্চ স্কুলস'; আর চীনে প্রচলিত ছিল 'কনফিউশাস একাডেমি' নামক নিজস্ব ব্যবস্থা।

অর্থাৎ, প্রতিটি জাতি ও ধর্ম তাদের নিজস্ব ধাঁচে যুগের পর যুগ শিক্ষা দিত। কিন্তু এরপর এলো ইউরোপীয় ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায়— অত্যাচারী ইতালীয় শাসক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের (Napoleon Bonaparte) যুগ, যিনি ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের পতাকা হাতে তুলে ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করলেন।[58] তিনি প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হিসেবে শিক্ষা

[58] নেপোলিয়ন বোনাপার্ট (১৭৬৯–১৮২১): তিনি ফ্রান্সের কর্সিকা দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) পর সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগ নিয়ে দ্রুত একজন শক্তিশালী সামরিক নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৭৯৯ সালে ক্ষমতা দখল করেন এবং ১৮০৪ সালে নিজেকে 'ফ্রান্সের সম্রাট' ঘোষণা করেন। নেপোলিয়ন প্রায় সমগ্র ইউরোপ জুড়ে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, যেগুলোকে বলা হয় 'নেপোলিয়নিক যুদ্ধসমূহ' (১৮০৩–১৮১৫)। তিনি নেপোলিয়নিক কোড (আইনব্যবস্থা) প্রবর্তন করেন, যা আজও বহু দেশের আইনের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৭৯৮ সালে তিনি অটোমান খেলাফতের অধীনস্থ মিসরে আক্রমণ চালান। নেপোলিয়নের দাবি ছিল— তিনি ইসলামের বন্ধু, এবং ফরাসি বিপ্লবের মূলনীতি (স্বাধীনতা ও সাম্য) মিশরের জনগণের জন্য নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এটি নিছক রাজনৈতিক কৌশল ছিল। যখন কায়রোর জনগণ ফরাসি দখলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন নেপোলিয়ন জামিয়া আল-আযহার মসজিদের ওপর

বিপ্লবকে বেছে নিলেন। প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতির মূলে হাত দিয়ে তিনি এমন এক নতুন কাঠামো দাঁড় করালেন, যা আগে কখনো দেখা যায়নি।

নেপোলিয়নের উপলব্ধি ছিল—শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন হলো সেনা গড়ার সর্বোত্তম অস্ত্র, চিন্তাধারার রূপান্তরের সূক্ষ্ম মাধ্যম এবং একনায়কতন্ত্র শক্তিশালী করার দৃঢ় বাহু। তাই তিনি ভেবেছিলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তিনি এমন এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তুলবেন যেখানে নাগরিকরা হবে আজ্ঞাবহ, দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী। ধর্মকে পিছনে ঠেলে রাষ্ট্রের চাহিদাকেই তারা অগ্রাধিকার দেবে। নাগরিকদের জন্য দেশভক্তিই হবে ধর্মসম, আর সহনাগরিকই হবে প্রকৃত ভ্রাতা। ফলে 'মিল্লাতের ভাই' ও 'রাষ্ট্রের ভাই'—দুটির মর্যাদা এক করে দেওয়া হবে, বরং কখনো কখনো দেশভ্রাতাকেই শ্রেষ্ঠ গণ্য করা হবে। এভাবে তিনি এমন এক ব্যবস্থা দাঁড় করালেন, যেখানে চাকুরিজীবী ও শিল্পশ্রমিকদের মাধ্যমে রাষ্ট্র চালিত হবে—অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবেরও বীজ বপন করা হলো।

---

কামানের গোলাবর্ষণ করান। এতে ডজন ডজন আলেম শহীদ হন এবং মসজিদের পবিত্রতা লঙ্ঘিত হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটি ছিল তার নিকৃষ্টতম অপরাধ। নেপোলিয়ন শুধু মিসরেই নয়, অটোমান খেলাফতের অধীন শাম ও ফিলিস্তিনেও আক্রমণ চালান। আক্কার যুদ্ধ (Siege of Acre)-এ তিনি অটোমান সেনাদের কাছে পরাজিত হন, যদিও তার যুদ্ধলোভে হাজারো মুসলমান প্রাণ হারান। তিনি মিথ্যা 'ইসলাম-বন্ধুত্ব' প্রদর্শনের জন্য আরবীতে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে নিজেকে 'ইসলামের রক্ষক' বলে দাবি করেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি কেবল নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মুসলমানদের ব্যবহার করছিলেন। তার নেতৃত্বে ফরাসি বাহিনী বহু ইউরোপীয় অঞ্চল দখল করে ফ্রান্সকে মহাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে, আর ব্রিটেন তার প্রধান শত্রু হয়ে ওঠে। তবে শেষ পর্যন্ত ১৮১৫ সালে বেলজিয়ামের ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হন। ব্রিটিশরা তাকে বন্দী করে একটি দ্বীপে নির্বাসিত করে, যেখানে ১৮২১ সালে তার মৃত্যু হয়।]

## আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেপোলিয়নের ছায়া

আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আপনি লক্ষ করলে (মুসলিম বা অমুসলিম যে দেশেই হোক) নেপোলিয়নের সেই ছায়া স্পষ্টভাবে দেখা যায়: জাতীয়তাবাদ ও ভৌগোলিক সংকীর্ণতা: Nation-state-এর ধারণাই হয়ে ওঠে শিক্ষার মূল অগ্রাধিকার।

চাকুরিজীবী মনোভাব: আধুনিক শিক্ষিত যুবকের মনে খুব কমই আসে স্বাধীন ব্যবসা বা উৎপাদন ব্যবস্থার চিন্তা। বরং বড় কোনো বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকুরি পাওয়াকেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধরা হয়। অথচ ঐসব কোম্পানির বিশাল অংশের মুনাফা মুসলিম ভূমিতে, বিশেষ করে ফিলিস্তিন ও গাজায় বর্বরতা চালাতে ব্যয় হচ্ছে—এ সত্য আজ স্পষ্ট। তবু শিক্ষিত সমাজের উচ্চতম স্বপ্ন হচ্ছে একটি 'ভালো চাকুরি'।

ধর্মবিমুখতা: সেক্যুলার মনোভাবই আধুনিক শিক্ষার অঙ্গ। এর সহজ সংজ্ঞা হলো—ধর্মহীনতা, বা অন্তত ধর্মের সঙ্গে দূরত্ব। সেক্যুলার মানুষ সব ধর্মকে সমান ভাবে, নিজেকে কোনো ধর্মের অংশ মনে করে না এবং বলে 'মানবতা সবচেয়ে বড় ধর্ম।' অদ্ভুত হলো—যারা অত উচ্চশিক্ষিত নয়, বরং কয়েক মাস কোনো ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ শেখে, তারাই পরে স্বাধীনভাবে ব্যবসা দাঁড় করাতে সক্ষম হয়। অথচ উচ্চশিক্ষিতরাই হয়ে ওঠে চাকুরিজীবী চিন্তার বন্দী। ইসলাম অবশ্যই বাণিজ্য, কৃষি ও চাকুরি—প্রত্যেকটিকেই গুরুত্ব দিয়েছে। তবে ভারসাম্য রক্ষা করেছে। অনেক সময় বাণিজ্যকেই বেশি পছন্দ করেছে, কারণ তাতে স্বাধীনতা আসে, দৃষ্টিভঙ্গির

বিস্তৃতি ঘটে, নানা জাতির সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং দাওয়াতি কাজ সহজ হয়।[59]

সবচেয়ে বড় কথা—অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্য জাতির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, যেমন আজ ক্রুসেডার ও জায়নিস্টরা করেছে।

নেপোলিয়নের শিক্ষা বিপ্লবের প্রধান পদক্ষেপ ধর্ম ও শিক্ষার বিভাজন: আধুনিকতার ভিত্তি গড়ে তুললেন—যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা রাজনীতি, বিজ্ঞান, আইন, অর্থনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ধর্মীয় মানসিকতা অতীতপন্থী মানস গড়ে তোলে—এমন যুক্তিতে তিনি শিক্ষাকে চার্চ থেকে আলাদা করলেন।

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা: ব্যক্তিগত উদ্যোগ নয়, শিক্ষা পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণালয়ের অধীনে হলো। এজন্য 'মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন' গড়ে তোলা হলো।

---

[59] যেমন দেখা যায়, কুরআন কারীম জীবিকার উপায়গুলোর মধ্যে যদি কোনো কিছুর উল্লেখ করেছে, তবে তা হলো বাণিজ্য। যেমন সূরা আস-সফফে (আয়াত ১০) জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য বাণিজ্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

একইভাবে, বিশ্বনবী ﷺ জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে যদি কোনো পেশা অবলম্বন করে থাকেন, তবে তা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। এরপর নবীগণের পর শ্রেষ্ঠতম মানুষ, আমাদের নেতা আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু—তাঁর সম্পর্কেও যে পেশা নির্ভরযোগ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেটিও ছিল বাণিজ্য।

অতঃপর রাসূল ﷺ সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ীকে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্যে থাকার সুসংবাদ দিয়েছেন।

(তিরমিযী: হাদীস ১২০৯, হাদীস হাসান বলেছেন)

এটাই এই লেখকের বিনীত অভিমত। তবে এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।]

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষা: প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা আলাদা করা হলো— প্রথমবারের মতো মিলিটারিস্ট ধাঁচে স্তরভিত্তিক স্কুল কাঠামো চালু হলো। পাঠ্যসূচি সংস্কার: বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস ও ফরাসি ভাষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ধর্মীয় বই ও আধ্যাত্মিক পাঠ বাদ দেওয়া হলো। নেপোলিয়নের ঘোষণা ছিল: "আমাদের সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জনগণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় মূল্যবোধ অর্জনে এগুলোই আমাদের প্রথম হাতিয়ার।" নেপোলিয়নের এই কাঠামো পরে এতটাই প্রভাব বিস্তার করল যে প্রুশিয়া (বর্তমান জার্মানি) ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে তা আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি হিসেবে গৃহীত হলো। জোহান ফিখটে (Johann Fichte) নামক দার্শনিক এটি নতুন আঙ্গিকে সাজালেন এবং নাম দিলেন 'আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা' (Modern Education System)। মূল কাঠামো নেপোলিয়নেরই ছিল, শুধু প্রয়োজনে কিছু শাখাগত পরিবর্তন আনা হয়েছিল।

পরে এই ব্যবস্থায় আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সংযোজিত হলো—

প্রথমত, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হলো। এমনকি কেউ যদি এই নির্দিষ্ট শিক্ষার মানদণ্ড পূরণ না করত, তবে তাকে সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রায় অচেনা এবং মূল্যহীন বলে গণ্য করা হতো। তার কোনো সামাজিক মর্যাদা থাকত না, সরকারি প্রকল্পেও তার কোনো স্থান থাকত না।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয়ভাবে চিন্তার স্বাধীনতার ওপর (Free thinking) কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হলো। নাগরিকরা সাধারণভাবে এবং বিশেষত যারা এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, তাদের চিন্তাভাবনা হবে ঠিক সেই রকমই—যেমনটি সরকার চাইবে। তাই ফিখটে (Fichte) ঘোষণা করেছিল— "যদি আমরা

আমাদের জাতিকে পুরোপুরি প্রভাবিত করতে চাই, তবে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ হবে মানুষের চিন্তার স্বাধীনতাকে ধ্বংস করা।"

এরপর খুব দ্রুত এই শিক্ষামডেল ছোটখাটো ইউরোপীয় জাতিগুলোর পাশাপাশি ব্রিটেন ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক শক্তিও গ্রহণ করে নিল। ফরাসিদের অগ্রগতি এবং আধুনিক শিক্ষায় তাদের অগ্রগামী রূপ দেখে ব্রিটিশ অভিজাতরা (Elites) ভীত হয়ে পড়ে। তারা আশঙ্কা করতে লাগল—আমরা যদি এভাবে পিছিয়ে পড়ি তবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব হারাব। ফলে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ধারা পাল্টে দেওয়া হলো। যদিও এগুলো প্রথমে ধর্মীয় ধাঁচে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং গির্জার সীমারেখা ও খসড়া অনুযায়ী পরিচালিত হতো, কিন্তু নেপোলিয়নের শিক্ষা মডেল দেখে কিংবা তার ভয়ে ব্রিটেন এগুলোর কাঠামো পরিবর্তন করে দিল। ফলে ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানগুলোও নতুন রূপ নিল। আজ যে প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বব্যাপী চিন্তার যুদ্ধে বড় ভূমিকা রাখছে, তখন থেকেই এগুলোর চরিত্র পাল্টাতে শুরু করে। এগুলো হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র, আইন, প্রশাসন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কেন্দ্র। সেখানে বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে গণিত, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, বস্তুবাদী দর্শন, উন্নয়নবাদী চিন্তাধারা ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এভাবেই নেপোলিয়নের শিক্ষাদর্শন সমগ্র ইউরোপ ও পশ্চিমা দুনিয়ার মূল ভিত্তি হয়ে যায়। গোটা পশ্চিম তখন নেপোলিয়নের স্বপ্ন ও চিন্তার মোহে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এরপর ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো যেখানে যেখানে দখল প্রতিষ্ঠা করে, সেখানে সেখানেও এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে—ভারতবর্ষ, আমেরিকার দখলীকৃত রাজ্য, আফ্রিকার উদীয়মান অঞ্চল প্রভৃতি। ধীরে ধীরে এটি এক বৈশ্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা (Global Education System) রূপে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষে ব্রিটেনের উদ্দেশ্যও প্রায় নেপোলিয়নেরই অনুরূপ ছিল—এমন 'বাবু' ও 'ক্লার্ক' তৈরি করা যারা জাতি ও বর্ণে ভারতীয় হলেও চিন্তা, আত্মা ও হৃদয়ে হবে ইংরেজ। তারা হবে ব্রিটিশদের অনুগত, বিশ্বস্ত নাগরিক এবং মানসিক দাস। এই উদ্দেশ্যে তারা নানা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, কলকাতা (১৮০০ খ্রি.) হিন্দু কলেজ, কলকাতা (১৮১৭ খ্রি.) দিল্লি কলেজ (১৮২৫ খ্রি.) আলীগড় কলেজ (১৮৭৫ খ্রি. এসব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যই ছিল নেপোলিয়নের শিক্ষা মডেল প্রচার করা।

সারকথা: নেপোলিয়নের শিক্ষাদর্শন থেকে উদ্ভূত 'রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা' ব্রিটেন গ্রহণ করল এবং উপনিবেশ ভারতে চাপিয়ে দিল। এর ফলে আমাদের জ্ঞান-আত্মাকে পশ্চিমা ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হলো। যদিও এই ব্যবস্থা বিজ্ঞান, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় উন্নতির পথ খুলে দেয়, কিন্তু একই সঙ্গে আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে শিকড়ে আঘাত হানে। এ কারণেই আল্লামা ইকবাল, মাওলানা শিবলী, মাওলানা সিন্দি এবং অন্যান্য চিন্তাবিদ এই ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন এবং ইসলামী শিক্ষার পুনর্জাগরণের চেষ্টা করেছেন। যেমন আগে বলা হলো—এই শিক্ষার রূপ ও প্রভাব এখন পুরো বিশ্বেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এটি ছিল আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ পর্যালোচনা। বিস্তারিত জানতে চাইলে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো সহায়ক হবে—

- The Idea of University — জন হেনরি নিউম্যান
- The Making of Modern University — জুলি রিউবেন

এছাড়া মুফতী তাকি উসমানী হাফিযাহুল্লাহ-এর 'গালাবায়ে মাগরিব কা ফিকরি ও তাহযিবি তাজজিয়া' শীর্ষক রচনা পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতা, শিক্ষা ও মানসিক আগ্রাসনের ব্যাপারে একটি বিস্তৃত ও গভীর বিশ্লেষণ।

## পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়, গোপন সংগঠন ও বৈশ্বিক শিক্ষানীতি

সময় গড়াতে গড়াতে যখন আমেরিকা এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার কৌশলগত লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত করল, তখনই এতে প্রবেশ ঘটল বৈশ্বিক গোপন সংগঠনগুলোর (Secret Societies)। উনবিংশ শতাব্দীতে তারা অর্থ ও নির্দেশনার মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে কিছুটা পরিবর্তন করে নিজেদের 'One World Vision' পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করল। প্রশ্ন হলো—শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থার লাগাম কার হাতে গিয়ে ঠেকে? সহজ উত্তর হলেও ব্যাখ্যা জটিল। আসল কথা হলো—এই লাগাম এসে ঠেকল কেবল ইসলাম বিরোধী নয়, বরং মানবতা বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর হাতে। তারা বিশ্বাস করে—অগ্রগতি ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাদের অধিকার। তারা নিজেদেরকে সমগ্র মানবজাতির শ্রেষ্ঠ জাতি মনে করে। তাদের উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর রহমতপূর্ণ দাসত্ব থেকে সরিয়ে এনে তথাকথিত স্বাধীনতার নামে শয়তানের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা। এদেরকেই কখনো ইলুমিনাটি, কখনো ফ্রিম্যাসন, কখনো সিক্রেট সোসাইটি নামে চিহ্নিত করা হয়। যখন পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রভাব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল এবং মানুষ এগুলোকে কেবল গ্রহণই করল না, বরং জীবনের গুপ্তধন বলে মনে করল, তখন গোপন সমাজগুলো এই ব্যবস্থার লাগাম হাতে নিয়ে এর ভেতরে নিজেদের রঙ ঢালতে শুরু করল। তারা তিনটি প্রধান কাজ করল—

## প্রথমত, অর্থায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ (Control with Funding)

রকফেলার, রথসচাইল্ড ইত্যাদি প্রভাবশালী পরিবারের বিশাল অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করল পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে—হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, ইয়েল, স্ট্যানফোর্ড ইত্যাদিতে। দান, স্কলারশিপ, গবেষণা অনুদান, চেয়ার, ভবন তহবিল—বিভিন্ন মাধ্যমে অর্থ ঢালা হলো। এর বিনিময়ে তারা পাঠ্যক্রম (Curriculum) ও শিক্ষকের নিয়োগে নিজেদের মত চাপিয়ে দিল। উদাহরণস্বরূপ, রকফেলার ফাউন্ডেশন ২০শ শতকের শুরুতে কার্নেগি ফাউন্ডেশনের সঙ্গে মিলে 'General Education Board' প্রতিষ্ঠা করে। এর লক্ষ ছিল আমেরিকার স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে শিল্পমুখী, পুঁজিবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলা।

## দ্বিতীয়ত, নীতিনির্ধারণে প্রভাব বিস্তার (Policy Manipulation)

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পর শিক্ষানীতিতেও তারা হস্তক্ষেপ শুরু করল। গবেষণার লক্ষ্য, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির মতো বিষয়ে তাদের বিশেষ দর্শন ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। শিক্ষা আর চরিত্রগঠন বা রাব্বানী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়—বরং হয়ে উঠল অর্থনৈতিক উপযোগিতা, উৎপাদনশীলতা এবং রাষ্ট্র ও বিদ্যমান ব্যবস্থার আনুগত্য শেখার উপায়। পাঠ্যক্রম থেকে ধর্ম বাদ দিয়ে তার স্থলে প্রবেশ করানো হলো ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবপূজা, ডারউইনিজম, নারীবাদ (Feminism) এবং নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের চিন্তাধারা।

## তৃতীয়ত, পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈশ্বিক মানদণ্ডে পরিণত করা (Global Academic Benchmark)

এরপর তারা নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে 'বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে খ্যাত করল। ফল কী হলো? বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থী, গবেষক ও সরকারসমূহ এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণামান, র‍্যাংকিং, পাঠ্যক্রম ও ডিগ্রিকে একমাত্র বৈশ্বিক মানদণ্ড হিসেবে স্বীকার করতে লাগল। আজও কোনো ইসলামী, আফ্রিকান বা এশীয় দেশ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়লে, তারা পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও ধরন নকল করে—যাতে তথাকথিত 'আন্তর্জাতিক মান' অর্জন করা যায়।

## ফলাফল ও সারসংক্ষেপ

আজকের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো—যে দেশেই হোক না কেন—মূলত সেই জ্ঞান, চিন্তা ও লক্ষ্যই বহন করছে যা পশ্চিমা গোপন গোষ্ঠীগুলো স্থির করেছে। ভারতের শিক্ষা বোর্ডগুলো যেমন—IB (International Baccalaureate), IGCSE (Cambridge), CBSE, ICSE, HSC, SSC, NIOS ইত্যাদি—সবকটাই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও স্তরে একই বৈশ্বিক শিক্ষাএজেন্ডার অনুসারী। যার মূল ভিত্তি হলো—ধর্মহীন মানবপূজা (Secular Humanism), পুঁজিবাদনির্ভর উৎপাদনশীলতা (Capitalist Productivity), পশ্চিমা জ্ঞানতত্ত্ব (Western Epistemology)—যেখানে জ্ঞানের উৎস আর ওহী নয়, বরং কেবল অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি; বৈশ্বিক নাগরিকত্ব (Global Citizenship) ও জাতিসংঘের এজেন্ডা ২০৩০, ওহী থেকে বিচ্ছিন্ন সমালোচনামূলক চিন্তা (Critical Thinking)

আজ শিক্ষার ডিগ্রি আসলে এক প্রকার মানসিক আনুগত্যের (Intellectual Allegiance) প্রমাণ যে, আপনি তাদের বানানো দর্শন, কাঠামো ও ব্যবস্থাকে বুঝতে, মানতে এবং তাতে কাজ করতে সক্ষম।

সুতরাং, স্পষ্ট হলো—বর্তমান আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার লাগাম আসলে রকফেলার ও রথসচাইল্ড প্রভৃতি ঘৃণ্য পরিবারগুলোর হাতে। যদিও তারা নিজেরাই কিছু করে না, বরং তাদের পেছনে রয়েছে আরও এক অদৃশ্য শক্তি ও বুদ্ধি, যার ইঙ্গিতেই তারা কাজ করে। কিন্তু যেহেতু "كل حق لا يقال" (প্রত্যেক সত্য কথা বলা যায় না), কারণ প্রত্যেক সত্য মানুষ হজমও করতে পারে না—তাই এ ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনার প্রয়োজনও নেই।

## প্রস্তাবিত পাঠ্য

যারা এ প্রসঙ্গে আরও গভীরভাবে জানতে চান, তাঁদের জন্য নিচের রচনাগুলো সহায়ক হবে—

উর্দু গ্রন্থ:

نظام تعلیم اور مغربی رجحانات — মাওলানা আলী মিয়া নাদভী রহিমাহুল্লাহ

اسلام اور مشرق و مغرب کی کشمکش — আলিজা ইজ্জত বেগোভিচ

ইংরেজি গ্রন্থ:

Education and the Cult of Efficiency — রেমন্ড ক্যালাহান

The Rockefeller File — গ্যারি অ্যালেন

(চলমান, ইনশাআল্লাহ)

# শাম তোমাদের কাছে আমানত

# শামের জিহাদের ভবিষ্যৎ | পর্ব –২, দ্বিতীয় কিস্তি

**—আবু উসামা আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক**

**আন-নাজিআত:** সম্মানিত আবু উসামা! আপনার বয়ান অনুযায়ী, শামের জিহাদি নেতৃত্ব থেকে যে বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে, আপনার মতে এর কারণ কী?

**উস্তায আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক:** আমার দৃষ্টিতে, সঠিক পথ থেকে এই ধরনের বিচ্যুতির মূল কারণ হলো—জায়নবাদী-খ্রিস্টান পশ্চিমা শক্তিগুলোর চাতুরী ও প্রতারণা, যা তারা কাতারি ও তুর্কি দোসরদের মাধ্যমে শামের মুজাহিদিন নেতৃত্বের সঙ্গে করেছে। এর ফলে শামের নেতৃত্ব তাদের সেই জিহাদি অগ্রজদের থেকে মানসিক, পদ্ধতিগত ও সাংগঠনিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে, যারা তাদেরকে প্রথমে ইরাকে এবং পরে শামের ময়দানে এনেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পশ্চিমারা এই ষড়যন্ত্রে সফল হয় এবং এটিকে নাম দেয় 'আল-কায়েদা থেকে সম্পর্ক ছিন্নকরণ'। বাস্তবে এটি ছিল ভ্রাতৃত্ব, চিন্তাধারা, পদ্ধতি ও সাংগঠনিক বন্ধন ছিন্ন করার নামান্তর।

আমি আগেই বলেছি, আমাদের এই যুগে জায়নবাদী-খ্রিস্টান পশ্চিমারা হলো শয়তানের প্রকাশিত এক রূপ। তার সবচেয়ে বড় লক্ষ্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা, ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লাগানো, সন্তানকে পিতা-মাতার অবাধ্য করা এবং কর্মীদেরকে তাদের আন্তরিক জামাআত ও

আত্মত্যাগী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা। এসব কাজে শয়তানের কাছে ফন্দি ও অজুহাতের কোনো ঘাটতি নেই। তাই যা কিছু ঘটেছে, তার সারাংশ এ যুগের বহু পর্যবেক্ষকের নিকট সুস্পষ্ট।

পশ্চিমা এই মিশন তাদের কাতারি ও তুর্কি এজেন্টদেরকে অর্পণ করে এবং আল-জাজিরার সাথে যুক্ত কিছু মিডিয়া পেশাজীবীদেরকেও এ কাজে নিযুক্ত করে। তারা পূর্ব থেকেই ওই অঞ্চলে জিহাদি কাফেলার নেতাদের সাথে গোয়েন্দা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিল। তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়—শুধু শাম নয়, বরং ইয়েমেন, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা এবং সোমালিয়ার মুজাহিদদের কাছেও পশ্চিমা প্রস্তাব উপস্থাপন করার। প্রস্তাবটি ছিল—বিপুল আর্থিক ও সামরিক সহায়তার নিশ্চয়তা, নিরাপত্তার গ্যারান্টি (যেমন ড্রোন হামলা থেকে সুরক্ষা) এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষায় আংশিক অংশগ্রহণের সুযোগ। শামের নেতৃত্ব এই আকর্ষণীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে, কিন্তু ইয়েমেন, উত্তর আফ্রিকা ও সোমালিয়ার ভাইয়েরা এটিকে জিহাদের ভবিষ্যতের জন্য ভয়াবহ হুমকি মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন। এখানেই শামের নেতৃত্বের বিচ্যুতির সূত্রপাত।

আপনার অবগতির জন্য বলছি, সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রস্তাব সর্বপ্রথম আল-কায়েদার আমীর ডা. আইমান আয-যাওয়াহিরী পেশ করেছিলেন—তবে দুটি শর্তের সাথে:

১. শামের মুজাহিদদের পূর্ণ ঐক্য গড়ে উঠবে।

২. শামে একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে আহলে শাম নিজেদের জন্য একজন আমীর নির্বাচিত করবে।

শুধু এই শর্ত পূর্ণ হওয়ার পরই আল-কায়েদা সাংগঠনিক সম্পর্ক ছাড়তে পারবে, ভাইদের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাবে এবং পরবর্তীতে ইসলামী ও জিহাদি ভ্রাতৃত্ব অব্যাহত থাকবে। কিন্তু শামের নেতৃত্ব এই দুটি শর্ত পূরণের আগেই 'বিচ্ছেদ ও সম্পর্ক ছিন্ন' করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তা ঘোষণা করে ফেলে।

তবে এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—বাস্তবে যা ঘটেছিল, তা কেবল সংগঠনগত বিচ্ছেদ ছিল না, বরং সকল প্রকার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানহাজি ও সাংগঠনিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো হয়েছিল। এই কারণেই সিরিয়ার নেতৃত্ব তাদের কয়েকজন পরিচিত সদস্যের মাধ্যমে পূর্বতন নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের আচরণের ওপর সহিংস আক্রমণ শুরু করে, যারা এখনও আল-কায়েদার সঙ্গে তাদের পুরোনো বাইয়াত অটুট রেখেছিল। তারা তাদের সুপরিচিত মুখপাত্রদের মাধ্যমে প্রকাশ্যে দাবি করতে থাকে যে, আল-কায়েদার অন্যান্য শাখার সঙ্গে—বিশেষ করে ইয়েমেন ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার শাখাগুলোর সঙ্গে—বাইয়াত ছিন্ন করতে হবে, অঙ্গীকার ভেঙে ফেলতে হবে এবং এ বিষয়টা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে। এখান থেকেই সেই বিচ্যুতিগুলো আরও প্রসারিত হতে থাকে, যেগুলো কাতার ও তুরস্ক শক্তভাবে লালন করছিল। আর আমরা কেবল আল্লাহর কাছেই অভিযোগ করি।

সিরিয়ার নেতৃত্বে এই বিচ্যুতির গ্রহণযোগ্যতা, তাতে সন্তুষ্টি ও এর ধারাবাহিকতার অন্যতম কারণ হলো সেই মতাদর্শিক ও কর্মপন্থাগত চাপ, যার সম্মুখীন তাদের অনেকেই হয়েছিল। এটি এমন এক পরিবেশ ছিল যা সঠিক ও সংযত চিন্তার বিকাশের জন্য মোটেও উপযুক্ত ছিল না। বিশেষ করে সেই সব ধারণা, যেগুলো ইরাকের মার্কিন কারাগার ক্যাম্প

বুকার ভেতরে জন্ম নিয়েছিল এবং বিকশিত হয়েছিল, পরে যেগুলো মিলিত হয়েছিল সিরিয়ার বাশার সরকারের কারাগার সাইদনায়া থেকে উঠে আসা চিন্তার সঙ্গে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বন্দীত্বের মধ্যে নির্যাতন ও নিপীড়নের চাপে জন্ম নেওয়া এই মানহাজি ও বুদ্ধিবৃত্তিক মিশ্রণ এক বিশাল মতাদর্শিক সংঘাতের জন্ম দেয়, যার ধুলো উড়তে শুরু করে সিরিয়ার বিপ্লবের শুরুর সময় থেকেই এবং গত কয়েক বছরে তা একেবারে চরমে পৌঁছে যায়।

ইরাকের 'বুকা কারাগার' থেকে বের হওয়া ব্যক্তিদের চিন্তা এবং সিরিয়ার 'সাইদনায়া কারাগার' থেকে প্রমাণপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসা ব্যক্তিদের ধারণা মিলেমিশে এমন এক নতুন মানসিকতার জন্ম দেয়, যা মানহাজ, চিন্তা, মতাদর্শ ও বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিচ্যুতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সামর্থ্য রাখত। সিরিয়ায় প্রবল প্রতিক্রিয়াশীলতার কারণে এই বিচ্যুতিগুলোর প্রভাব সিরিয়ার জনসাধারণের চেতনার ওপরও ব্যাপকভাবে পড়ে। এর পরিণতিতে ইরাক ও সিরিয়ার কিছু অংশে 'দায়েশ' কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরানো তাদের জন্য এক প্রবল নেশায় পরিণত হয়। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির প্রধান কারণগুলোর মধ্যে ছিল—আজিমত বা অটল সংকল্পের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে শরীয়ত অনুমোদিত ছাড় না দেওয়া এবং প্রয়োজনের অজুহাতে বহু নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া। আর এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল মতভিন্নতা থাকা ব্যক্তিদের রক্ত ঝরানোর সাহস করা। এটি আর কোনো গোপন বিষয় নয় যে 'বুকা–সাইদনায়া' ধাঁচের এই মানসিকতা এবং এর বাহকদের আইনগত, সংগঠনগত ও সামাজিক সিদ্ধান্তসমূহ

মানবজাতির কোনো জাতির জন্য মর্যাদা বা গৌরব আনতে পারে না, বরং কলঙ্কই বয়ে আনে।

তাই আমি নিশ্চিত, সিরিয়ার নেতৃত্ব তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মতাদর্শিক ভারসাম্য, কিংবা মানহাজে দৃঢ়তা আর ফিরে পাবে না। তারা তাদের বন্দী চেতনাকে 'বুদ্ধিবৃত্তিক গুয়ানতানামো' এবং 'মতাদর্শিক কারাগার' থেকে মুক্ত করতে পারবে না, যদি না সেই ভয়ংকর বিপর্যয় তাদের সেই 'বন্ধু সুলভ' ও 'ভ্রাতৃপ্রতিম' দেশগুলো থেকে আলাদা করে দেয়—যাদের ভরসায় তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল এবং যাদের কোলে নিজেদের নিক্ষেপ করেছিল। আমি মনে করি না, নসীহতের ভাষণ তাদের ভারসাম্য ও দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনতে বিশেষ কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে। যদিও উপদেশ ও দিকনির্দেশনা দেওয়া অবশ্যই জরুরি, কিন্তু মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বভাব হলো—তারা ধ্বংসের সকাল না দেখা পর্যন্ত উপদেশকে উপলব্ধি করে না।

**আন-নাজিআত:** সম্মানিত উস্তায! হয়তো আপনি জানেন ও উপলব্ধি করেন যে সিরিয়ার জনগণ, আল-কায়েদা এবং এর আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ সংশয় ও আপত্তি পোষণ করে। সিরিয়ার বিপ্লবী তরুণদের এক বড় অংশের মধ্যে প্রচলিত ধারণা হলো— আল-কায়েদা তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রান্তিক অবস্থানে চলে গেছে। তাদের মতে এর মূল কারণ হলো এক অযৌক্তিক ও অবাস্তববাদী মতবাদে আঁকড়ে থাকা—যা হলো 'আন্তর্জাতিক জিহাদ' এর ধারণা। অথচ সিরিয়ার জনগণ স্থানীয় জিহাদের প্রতি অঙ্গীকার রেখে মাত্র এগারো দিনের মধ্যে যা অর্জন করেছে, তা আল-কায়েদা ত্রিশ বছরের আন্তর্জাতিক জিহাদের মধ্যেও অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

তাহলে সম্মানিত আবু উসামা! সিরিয়ার জনগণ যখন তাদের স্থানীয়, আঞ্চলিক জিহাদের মাধ্যমে এত বড় সাফল্য অর্জন করেছে, তার পর আল-কায়েদার আন্তর্জাতিক জিহাদের প্রতি অঙ্গীকারের কার্যকারিতা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি বদলেছে?

**উস্তাদ আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক:** আমার প্রিয় ভাই! আমি আপনাকে স্পষ্ট করে বলছি, দামেস্ক মুক্ত হওয়ার পর, বহু কারণের প্রেক্ষিতে আমি আন্তর্জাতিক জিহাদের ধারণার প্রতি আরও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আরও বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং আরও বেশি অনুগত হয়ে গিয়েছি। এর বিস্তারিত আমি অন্য কোনো সময় আপনাকে বলতে পারব। তবে এর মানে এই নয় যে, আমি নতুন সিরিয়াকে আগুনে নিক্ষেপ করার আহ্বান জানাচ্ছি, বা তাকে জায়নবাদী–ক্রুসেডার পশ্চিমাদের সঙ্গে এক আন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভাটিতে ঠেলে দিচ্ছি—যখন এই ভূখণ্ড ইতিমধ্যেই ক্ষতবিক্ষত এবং এরকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত নয়।

আমার ভাই! আপনার জানা উচিত যে আমাদের বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক জিহাদের পতাকাবাহীরা (অর্থাৎ আল-কায়েদা) কখনও সিরিয়াকে আন্তর্জাতিক জিহাদের ঘাঁটি বানানোর ইচ্ছা পোষণ করেনি, কিংবা তেমন কোনো প্রেরণাও দেয়নি। তারা কেবল ইসলামী শরীয়তের দাবি অনুযায়ী এ কথাটাই স্পষ্ট করেছে যে, সিরিয়ার ভূমি পশ্চিমা, প্রাচ্য ও জায়নবাদী দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করা এবং নুসাইরি শাসনকে উৎখাত করা অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, আল-কায়েদার নেতারা তো ২০১২ সাল থেকেই সিরিয়ার নেতৃত্বকে—বিশেষ করে জোলানী সাহেবকে—উপদেশ দিয়ে আসছেন যেন তারা সেই সব বাহ্যিক চিহ্ন-লক্ষণ ত্যাগ করেন, যা পর্যবেক্ষকদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে সিরিয়ার জিহাদ

আন্তর্জাতিক জিহাদের সঙ্গে অঙ্গীভূত। আপনি যদি শায়খ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবি রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক সিরীয় বিপ্লবের প্রথম বছরেই জোলানি সাহেবকে লেখা চিঠিটি দেখেন, তবে বুঝবেন—সিরিয়ার মাটিতে আন্তর্জাতিক জিহাদের পরিকল্পনা নিয়ে আসছিলেন মূলত জোলানি সাহেব ও তাঁর ইরাকি ধারা-অনুসারী সাথিরা, অথচ আল-কায়েদা নেতৃত্ব তাদের তা থেকে নিবৃত্ত করছিল। বরং তারা অনুরোধ করেছিল শত্রুদের দুর্বল করা হোক, কিন্তু তাদের আতঙ্কিত বা উসকে না দেওয়া হোক।

যাই হোক, যেটি আমার বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে দৃঢ়তা আনে তা হলো—অন্যদের মতো আমিও বাশার আল-আসাদের প্রাক্তন শাসন ব্যবস্থার পতন ও মুসলিমদের বিজয় অনুভব করেছি। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখিনি এমন এক পূর্ণ বিপ্লবী জয়, যা ইতিহাসের অন্য বিপ্লব বা বিজয়ের মানদণ্ড পূরণ করে। দামেস্কে প্রবেশ করে বিপ্লবীরা স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই আমরা দক্ষিণ সিরিয়ায় জায়নবাদী দখলদারির হস্তক্ষেপ এবং বৃহৎ অঞ্চলে তাদের আধিপত্য ঘোষণাও দেখেছি। এর মানে হলো—'হাইয়াত তাহরির আশ-শাম'-এর বেছে নেওয়া স্থানীয়-আঞ্চলিক জিহাদের ধারণা পুরো সিরিয়া মুক্ত করতে সক্ষম হয়নি এবং কোনো বিশ্ববিপ্লবের প্রকৃত চাহিদাও পূরণ করতে পারেনি। উপরন্তু, তাদের এ সংগ্রামকে 'স্থানীয়-আঞ্চলিক জিহাদ' বলা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কারণ, প্রকৃত আঞ্চলিক জিহাদ হলো—যেখানে মুসলিম দেশ বা ভূমিতে আক্রমণ করা সব দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধেই একযোগে লড়া হয়।

আধুনিক দৃষ্টান্ত হিসেবে আফগানিস্তান, ইরাক, সোমালিয়া, উত্তর আফ্রিকার মালি ও অন্যান্য স্থানের জিহাদকে দেখা যেতে পারে। তারা সবাই একসাথে তাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করা সব আগ্রাসীর মোকাবিলা করেছে। কেউ কেউ

তো চল্লিশেরও বেশি দেশের সমন্বিত ক্রুসেডার জোটের বিরুদ্ধেও লড়েছে, অথচ অবস্থান করেছে স্থানীয় আঞ্চলিক ময়দানের ভেতরেই। কিন্তু কেবল একটি দখলদার বা তার স্থানীয় এজেন্টের সঙ্গে লড়াই করে বাকি বৃহৎ দখলদারদের বিরুদ্ধে জিহাদ থেকে সরে আসা, কিংবা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চাওয়া—আমার সীমিত বোধে এটি প্রকৃত স্থানীয়-আঞ্চলিক জিহাদ নয়।

হ্যাঁ, শরীয়ত ও ফিকহি দিক থেকে অনুমোদিত হতে পারে যে—কাউকে আগে মোকাবিলা করা, আবার কাউকে সাময়িকভাবে এড়িয়ে যাওয়া, যতক্ষণ না আমরা ধীরে ধীরে তাদেরকে ভূমি থেকে সরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এই আংশিক সংগ্রামকে পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক জিহাদ বলে দাবি করা সিরিয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবে খাটে না। তারও উর্ধ্বে, 'হাইয়াত তাহরির আশ-শাম'-এর কিছু ইরাকি মুখপাত্র তো বছরখানেক আগেই ঘোষণা দিয়েছিল—জিহাদ শেষ হয়ে গেছে! আজ আমরা দেখি—সিরিয়ার বিপ্লবী নেতৃত্বরা রুশ ও মার্কিন আধিপত্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করছে এবং জনগণের প্রশ্নের উত্তরে তারা ইচ্ছে মতো ব্যাখ্যা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। যখন তারা অতীতের কোনো অভিজ্ঞতা ও সান্ত্বনাদায়ক দৃষ্টান্ত খুঁজতে গেল, তখন কেবল একটিই উদাহরণ পেল—সৌদি অভিজ্ঞতা, যারা আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করে নিরাপত্তা ও সামরিক শক্তির নিশ্চয়তা পেয়েছিল। ফলে আজ আমরা দেখি—সিরিয়ার বিপ্লবী নেতৃত্বরা মুহাম্মাদ বিন সালমানের 'ভিশন ২০৩০' অনুসরণ করতে চাচ্ছে, এমন রাষ্ট্রগুলির পিছে ছুটছে যাদের কর্মফল নিয়ে উম্মাহ গর্বিত হতে পারে না কিংবা যা জাতিসমূহের মাঝে তাদের মর্যাদা বাড়ায়নি। তারা যদি বরং চীন বা জাপানের অর্থনৈতিক-শিল্প উন্নয়নের অভিজ্ঞতার দিকে তাকাতো, তবে তা অনেক বেশি

যুক্তিসঙ্গত ও সুন্দর হতো। কিন্তু আল্লাহই তাঁর কাজে প্রবল, অথচ অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না। আজ আমি যা প্রত্যক্ষ করছি, তা হলো—সিরিয়ার বিপ্লবের সাথে যুক্ত আমাদের ভাইয়েরা সামরিক ও রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে নিজেদের ভূখণ্ডে দখলদারিত্ব মেনে নিচ্ছে এবং দখলদারদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করছে। এতে তারা পশ্চিমা শক্তিগুলোকে—যারা বিপ্লবকে ভয় পায়—তাদের ঘাঁটি ও ক্যাম্প স্থাপনের অনুমতি দিচ্ছে। হয়তো তারা এ বিশ্বাসে পৌঁছেছে যে সৌদি অভিজ্ঞতাই এখানে আদর্শ, যেখানে সামরিক নিরাপত্তার চুক্তির আড়ালে হারামাইন শরীফাইনের ভূমিতে জায়নবাদী-খ্রিস্টীয় উপস্থিতিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। অথচ বাস্তবে এটি মুসলিম ভূমিতে প্রকাশ্য দখলদারিত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। আমার ধারণা—সিরিয়ার বিপ্লবী নেতৃত্ব এভাবে অপমানজনক পথ বেছে নিয়েছে কারণ তাদের অধিকাংশই 'জালুতি কমপ্লেক্স'-এ আক্রান্ত। যেমন কুরআনে এসেছে:

لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ

"আজ আমাদের কাছে জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়বার কোনো শক্তি নেই।" (সূরা আল-বাকারা ০২:২৪৯)

আমি স্পষ্ট বলছি—অবশেষে সময় এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যে যারা আন্তরিকভাবে ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে, তারা আল-কায়েদার দাওয়াত ও পদ্ধতিকে গ্রহণ করতেই বাধ্য হবে। তবে এর মানে এই নয় যে তারা সবাই আল-কায়েদার সংগঠন বা এর শাখায় যোগ দেবে। কারণ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—আল-কায়েদার দাওয়াত ও পদ্ধতি হলো একটি খাঁটি কুরআনিক পদ্ধতি, যার ভিত্তি কুরআন-সুন্নাহ এবং সেই

শরীয়তে নিহিত, যা যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ পদ্ধতি এমন এক দিশারী, যা মানবসমাজের উত্থান-পতনের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অমোঘ নিয়ম ও সুন্নাতকে বিবেচনায় রাখে। আর সঠিক পথের দিকে দিশা দেওয়ার মালিক কেবল আল্লাহ।

**আন-নাজিআত:** প্রকৃতপক্ষে, সম্মানিত আবু উসামাহ! আপনি আন্তর্জাতিক জিহাদের ব্যাপারে আমার বহু ধারণাকে নাড়িয়ে দিয়েছেন, আর স্থানীয় বা আঞ্চলিক জিহাদ সম্পর্কে আমার মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেটিকেও গভীরভাবে আলোকিত করেছেন। আমি চাই, আপনি আমাকে এবং এ বিষয়ে আগ্রহী অন্য ভাইদেরকে সরল ও বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করুন—আল-কায়েদার মনহাজ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক জিহাদ বলতে কী বোঝায় এবং এটি অন্যান্য জিহাদি গোষ্ঠীর স্থানীয় জিহাদ ধারণার থেকে কতখানি ভিন্ন।

**উস্তায আব্দুল আজিজ আল-হাল্লাক:** এই প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ এবং বহু উদ্ধৃতির দাবি রাখে; বিস্তারিত ব্যাখ্যা চাইলে এমনকি হয়তো এ সাক্ষাৎকারের বাকি পুরো সময়ই নিয়ে নিতে পারে। তবু যেহেতু আপনি আমাকে এই প্রসঙ্গ তুলতে প্রণোদিত করেছেন, তাই অনুগ্রহ করে আমাকে অনুমতি দিন—আমি এখানে সংক্ষেপে আল-কায়েদার বার্তা, আন্তর্জাতিক জিহাদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মুসলিম উম্মাহ যে গভীর সংকটে পড়েছে তার সমাধানে তারা যে পথরেখা প্রস্তাব করেছে, সে বিষয়ে কিছু আলোকপাত করি; যা অধিকাংশ মানুষই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি।

ঊনবিংশ শতকের শুরুতে উসমানি খিলাফতের শক্তি ও ঐক্যের পতনের পর এবং বিংশ শতকের সূচনায় মুসলিম দেশগুলিকে বিভক্ত করে খণ্ডিত করার ক্রুসেডিয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর থেকে, ঔপনিবেশিক ক্রুসেডি অভিযানের মোকাবিলায় বহু জিহাদি আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। মুজাহিদরা এই আক্রমণকারী বাহিনীর উপর বারবার আঘাত হানে এবং বহু যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বহিরাগত দখলদারদের (ক্রুসেডি ঔপনিবেশিক শক্তি) আনুষ্ঠানিক বিদায়ের পরই তাদের বিকল্প হিসেবে অভ্যন্তরীণ এজেন্টদেরকে—যাদেরকে বলা যায় 'বাদামী দখলদার'—প্রস্তুত ও স্থাপন করা হয়, ফলে এ জিহাদি জাগরণ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায় এবং তার গতি থমকে যায়। সে সময়ে মুসলিম উম্মাহ সরল বিশ্বাসে ভেবেছিল—তারা স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ন্যায়বিচার অর্জন করেছে। আনন্দে উদযাপন করেছিল তথাকথিত মুক্তি। কিন্তু আসলে এ ছিল এক প্রতারণা। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—খ্রিস্টান জাতিগুলো সবসময়ই মুসলিম উম্মাহর জিহাদি পথগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এসেছে এবং দ্রুতগতিতে নিজেদের কৌশল পরিবর্তন করেছে। আধুনিক ইতিহাসও প্রমাণ করে যে, সামরিক পরাজয়কে তারা কূটনীতির মাধ্যমে ঢেকে দিয়ে পরে তা এক বৃহৎ কৌশলগত জয়ে রূপান্তরিত করার অসাধারণ সক্ষমতা রাখে। মুসলিম দেশগুলো স্বাধীনতা দিবস পালন করার পর সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে বুঝল—তারা প্রকৃত কোনো স্বাধীনতা, ন্যায় বা মুক্তি পায়নি। বরং এই দেশীয় এজেন্টরা বহিরাগত ঔপনিবেশিক শক্তির চেয়েও বেশি সহিংস, হিংসাপরায়ণ ও অপরাধপ্রবণ প্রমাণিত হয়েছে। যেসব সরকারকে তারা ইসলামী সরকার ভেবেছিল, আসলে সেগুলো ছিল কেবল ওই ক্রুসেডি শক্তির ক্রীড়নক। ফলে জিহাদি

আন্দোলনের দৃষ্টি ঘুরে গেল নিজ দেশের সরকার ও শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিকে। এভাবেই জন্ম নিল 'স্থানীয় আঞ্চলিক জিহাদ'-এর ধারণা, যেখানে প্রতিটি দেশের মানুষ নিজেদের শাসক ও স্থানীয় অত্যাচারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো। কিন্তু দীর্ঘ সংগ্রামের পরও তারা সেই সরকারগুলোকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়। তখনই স্পষ্ট হলো—এই সরকারগুলো আসলে কুফরের কেন্দ্র—আমেরিকা ও পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ সমর্থনপ্রাপ্ত। সেখান থেকেই তারা শক্তি অর্জন করেছে। এই প্রেক্ষাপটে জিহাদি আন্দোলনের বহু সদস্য সংশয়ে পড়ল। কেউ কেউ ফিরে গেল দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে; কেউ কেউ পুরো পদ্ধতিই পুনর্বিবেচনা করে চিন্তাগত পশ্চাদপসরণ করল। অনেকেই মনে করল, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সরকার উৎখাত করা সম্ভব নয়। ফলে কেউ রাজনৈতিক পথে ঝুঁকল, নির্বাচনে অংশ নিল, এজেন্ট সরকারকে বৈধতা দিল এবং সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় নিজেদের ঠাঁই করল। কেউ কেউ সামরিক অভ্যুত্থান বা গণঅভ্যুত্থান উসকে দেওয়ার চেষ্টা করল। আবার অন্যরা আগের অবস্থানেই দৃঢ় রইল—অর্থাৎ অস্ত্র হাতে স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া, যতদিন না তাদের পতন ঘটে।

এই ভয়াবহ চিন্তাগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের ছায়াতেই বেড়ে উঠেছিল আল-কায়েদার নেতৃত্ব। আল্লাহর ইচ্ছায় তারা অপ্রত্যাশিতভাবে শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ-এর নেতৃত্বে আফগান জিহাদে মিলিত হয়। প্রথমদিকে এ জিহাদ ছিল আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট শাসকদের বিরুদ্ধে। কিন্তু যখন মুজাহিদরা তাদের পতনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেল, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্র সরকারকে রক্ষার জন্য সরাসরি দখলদার

হয়ে প্রবেশ করল। এর পর শুরু হলো এক দীর্ঘ দশ বছরের যুদ্ধ, যার সমাপ্তি ঘটল আফগানিস্তানের মুক্তি ও দ্বিমেরু বিশ্বের একটি মহাশক্তি—সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে। এ অভিজ্ঞতা তরুণ মুজাহিদদের নতুন লক্ষ্য ও কৌশল নিয়ে গভীর চিন্তার দিকে ঠেলে দিল।

১৯৯৫ সালে বহু আলোচনার পর আল-কায়েদার নেতারা সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন—মুসলিম ভূমির মুক্তির প্রকৃত পথ হলো সেই শক্তিগুলিকে আঘাত হানা, যারা এজেন্ট সরকারগুলিকে টিকিয়ে রেখেছে। তারা হলো আসল শত্রু—যারা সামরিক ঘাঁটিতে নিজেদের সুরক্ষিত রাখে, অথচ আমাদের দেশীয় সৈন্য ও লোকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধেই দাঁড় করায়। এখান থেকেই উদ্ভব হলো 'আন্তর্জাতিক জিহাদ'-এর ধারণা।

এর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৯৬ সালে, যখন শায়খ উসামা রহিমাহুল্লাহ আফগানিস্তান থেকে ঘোষণা দেন: "হারামাইন শরীফাইনের ভূমিতে দখলদার আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা: আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের তাড়াও"। এ ছিল ১৫ আগস্ট, ১৯৯৬ (১ রবিউস সানি ১৪১৬ হিজরী)। শায়খ উসামা এতে স্পষ্ট করে দেন—আমাদের প্রধান লক্ষ হলো জায়নবাদী-ক্রুসেডার জোট, যারা এই যুগে কুফরের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

তিনি বলেন: "সবাই মানে যে, যখন লাঠি বাঁকা হয় তখন ছায়া সোজা হতে পারে না। তাই এ গুরুত্বপূর্ণ শত্রুকেই আঘাতের কেন্দ্র বানাতে হবে, যে শত্রু উম্মাহকে বহু দশক ধরে জাতীয় রাষ্ট্র আর ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত করেছে। মুসলিম ভূমিতে যখনই কোনো সংস্কার আন্দোলন উঠে, তখন এই ইহুদী-খ্রিস্টান জোট তাদের এজেন্টদের দিয়ে তা দমন করে। কখনো কখনো তারা সশস্ত্র সংঘর্ষে ঠেলে দিয়ে শুরুতেই তাকে শেষ করে দেয়। আজকের বাস্তবতায় সঠিক পথ হলো—যে নীতি আলেমরা স্থির

করেছেন, অর্থাৎ কুফরের শীর্ষে অবস্থানকারী আমেরিকাকে উৎখাত করা। ছোট ক্ষতি মেনে নিয়ে বড় ক্ষতি প্রতিহত করা। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই—এই দখলদার আমেরিকাকে প্রতিহত করা ঈমানের পরেই সর্বোচ্চ ফরয।" তিনি আরও বলেন: "এই আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিহত করা সম্ভব নয় মুসলিম সমাজের সব স্তরের অংশগ্রহণ ছাড়া। তাই ক্ষুদ্র মতপার্থক্য উপেক্ষা করা আবশ্যক, কারণ সে মতভেদের ক্ষতি আমেরিকার অব্যাহত আধিপত্যের ক্ষতির তুলনায় কিছুই নয়। আজ প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব—এ শত্রুর বিরুদ্ধে উম্মাহকে উজ্জীবিত ও সক্রিয় করা। কারণ আমেরিকাই আমাদের দ্বীন ও দুনিয়া ধ্বংস করছে। হারামাইন ও বাইতুল মুকাদ্দাস আজ ইসরাঈলি-আমেরিকানদের দখলে। তাই অভ্যন্তরীণ সংঘাত থেকে বিরত থাকতে হবে; দখলদার শত্রুর উপস্থিতিতে যেকোনো অন্তর্দ্বন্দ্বই ভয়াবহ ভুল, যা কেবল বিশ্ব কুফরের স্বার্থে কাজ করে।"

তিনি সতর্ক করে বলেন: "আমাদের দুর্বল সামরিক সক্ষমতা ও শত্রুর বিপুল শক্তি বিবেচনায়, উপযুক্ত কৌশল হলো হালকা, দ্রুতগামী, গোপন তৎপরতার বাহিনী—অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধ। এতে সাধারণ মুসলমানও অংশ নিতে পারবে। প্রথাগত যুদ্ধের জালে না জড়িয়ে, বরং বিচ্ছিন্ন সাহসী অভিযানের মাধ্যমে শত্রুকে ভেতর থেকে আঘাত করতে হবে। মুসলমানের রক্তক্ষয় এড়িয়ে চলা অপরিহার্য। যদিও আমরা জানি মুসলিম জনগণের উপর নেমে আসা দুর্দশার দায়ভার তাদেরই সরকারগুলির উপর, কিন্তু আসল রোগের মূল, সব দুর্দশার উৎস—এই দখলদার আমেরিকাই। তাই আমাদের সংগ্রাম কেন্দ্রীভূত হতে হবে এই শত্রুকে হত্যা, ধ্বংস, প্রতিহত ও তাড়া করার ওপর। ইনশাআল্লাহ, সে সময় আসবে যখন মুসলমানরা

নিজেদের হাতে পরিস্থিতি শোধরাবে, আল্লাহর বাণীকে উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করবে, কুফরের অহংকার ভেঙে দেবে এবং আক্রমণকারীদের কঠিন হাতে আঘাত করবে, অধিকার তাদের হকদার মালিকদের ফিরিয়ে দেবে এবং নিজেদের প্রকৃত ইসলামি দায়িত্ব পালন করবে।”

(চলবে, ইনশাআল্লাহ)

# দৃষ্টিভঙ্গি

# মুমিনের প্রজ্ঞা

জাইন আলী

আল্লাহ সৃজিত এই বিশ্বজগত অগণিত বিস্ময় ও রহস্যে ঘেরা। সর্বত্র তাঁর সৃষ্টিশক্তির মহিমা ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এই বিস্ময়কর সৃষ্টির মাঝে মানুষের বুদ্ধি এক বিশেষ আসন দখল করে আছে। মানববুদ্ধি নিজেই বহু নতুন বিস্ময় সৃষ্টি করেছে—হোক তা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কিংবা স্থাপত্যের নৈপুণ্য। আসলে এগুলো সবই আল্লাহর দান করা প্রজ্ঞার অলৌকিক প্রকাশ। ইতিহাসের প্রতিটি যুগে মানবীয় বুদ্ধি সভ্যতা, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং সামরিক শক্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

কিন্তু বর্তমান যুগ—যে যুগকে দাজ্জালের আগমনের প্রস্তুতির কাল বলা হয়—সে এক সম্পূর্ণ নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন কালে, এমনকি দেড়শত বছর আগেও, যুদ্ধের নিয়ম ছিল সরাসরি মোকাবিলা। শত্রুকে আক্রমণ করে পরাজিত করা হতো। উভয়পক্ষ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তুত হতো, আর যে পক্ষ শক্তিশালী প্রমাণিত হতো, সে-ই বিজয়ীর আসনে বসত। সবকিছু দৃশ্যমান ছিল—যোদ্ধারা জানত তারা কীসের জন্য লড়ছে, আর বিশ্বাসঘাতকও জানত সে নিজের বিবেক বিক্রি করেছে। কিন্তু আজকের যুগে শয়তানি শক্তি এমন এক প্রতারণা চালু করেছে যে, মানুষ আন্তরিক নিষ্ঠায় কাজ করলেও বুঝতেই পারে না তার শ্রম ও শক্তি আসলে শত্রুর পাল্লা ভারী করছে। ইকবাল তাঁর কবিতায় এই বাস্তবতার কী চমৎকার প্রতিচিত্র এঁকেছেন:

زمانے کے انداز بدلے گئے

যুগের ধরন বদলে গেছে, নতুন রূপ ধারণ করেছে জীবন।

نیا راگ ہے ساز بدلے گئے

নতুন সুর উঠেছে, বাদ্যযন্ত্রও বদলে গেছে।

ہوا اس طرح فاش رازِ فرنگ

এভাবে ফাঁস হয়ে গেল পশ্চিমের লুকানো রহস্য—

کہ حیرت میں ہے شیشہ بازِ فرنگ

যাতে বিস্মিত হয়ে গেল পশ্চিমের নিজস্ব কারিগরও।

پرانی سیاست گری خوار ہے

পুরোনো রাজনীতি আজ অপমানিত ও ম্লান।

زمیں میر و سلطاں سے بیزار ہے

ধরণী আজ রাজা-বাদশাহ আর সামন্তদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

گیا دورِ سرمایہ داری گیا

শেষ হয়ে গেছে পুঁজিবাদের দাপট

تماشا دکھا کر مداری گیا

যেন খেলা দেখানো এক জাদুকরের বিদায়ের মতো।

گراں خواب چینی سنبھلنے لگے

চীনের গভীর নিদ্রিতরা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে

ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے

হিমালয়ের ঝরনাধারা আবার ফুঁসে উঠছে।

دلِ طورِ سینا و فاراں دو نیم

সিনাই আর ফারানের তূর পর্বতের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে গেছে

تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم

এবং মূসা আবার প্রতীক্ষায় রয়েছেন প্রভুর জ্যোতির ঝলক দেখার।

مسلماں ہے توحید میں گرم جوش

মুসলমান আজ তাওহীদের তাপে উজ্জ্বল

مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش

তবুও তার হৃদয় এখনো অন্ধকারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

تمدن، تصوف، شریعت، کلام

সভ্যতা, সুফিবাদ, শরীয়ত, দর্শন—

بتانِ عجم کے پجاری تمام

সবকিছু যেন আজ পারস্যের মূর্তিপূজার মতো হয়ে পড়েছে।

حقیقت خرافات میں کھو گئی

সত্য হারিয়ে গেছে কুসংস্কারের জটিল ভিড়ে

یہ امت روایات میں کھو گئی

এই উম্মাহ ডুবে গেছে কেবল প্রথা আর রীতির গোলকধাঁধায়।

لبھاتا ہے دل کو کلامِ خطیب

বক্তার বাগ্মিতা হৃদয়কে টানে বটে

مگر لذتِ شوق سے بے نصیب

কিন্তু অন্তরের সত্যিকারের আকাঙ্ক্ষার স্বাদ থেকে বঞ্চিতই রয়ে যায়। »›

একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো, সে ঈমানের আলোয় ভবিষ্যতের বিপদ-আপদকে আগে থেকেই চিনতে পারে। সে কেবল অতীত-বর্তমানের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে আবদ্ধ থাকে না। কিন্তু আজ দাজ্জালীয় শক্তি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, যেখানে বহু ঈমানদার অনিচ্ছাকৃতভাবেই নিজেদের শক্তি কাফের ও শয়তানের কাজে ব্যয় করছে।

উম্মতের এক অংশ এমন যে, তারা কিছু প্রথা-অনুষ্ঠানকে ইবাদত ভেবে নিয়েছে এবং সেগুলোকেই পুরো দ্বীন বানিয়ে বসেছে। তাদের সমস্ত চেষ্টা অন্যদের কাছে এই আচারগুলোর সত্যতা প্রমাণে সীমাবদ্ধ। অথচ তারা কাফেরদের জুলুম, তাদের ষড়যন্ত্র ও দ্বীনের উপর আক্রমণ থেকে পুরোপুরি চোখ ফিরিয়ে রেখেছে। আবার অনেকে কুসংস্কার আর ব্যক্তিপূজাকে দ্বীন বানিয়ে ফেলেছে—ধনসম্পদ ও সময় অকর্মণ্য, পাপাচারী ও ফাসিক-ফাজের লোকদের পেছনে বিলিয়ে দিচ্ছে এবং সেটাকেই ধর্মসেবা ভেবে বসেছে। কেউ কেউ শত্রুর তৈরি করা ব্যবস্থার ভেতর বসে কল্যাণের খোঁজ করতে গিয়ে জীবন ব্যয় করে দিচ্ছে। এমনকি অনেকে তো মানবাধিকারের নামে দাঁড় করানো ফাঁপা দাবিগুলোকে আসল দ্বীন ও প্রকৃত ধর্মসেবা বলে বিশ্বাস করছে। তাদের দৃষ্টিতে নামায, রোযা, হজ, যাকাত—এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ—এসবের আর কোনো গুরুত্ব নেই। কারণ, দুনিয়ার নিষ্ঠুরতম অত্যাচারীরা তাদেরকে এমন শিক্ষা দিয়েছে যে—গাজায় চলমান অমানবিক হত্যাযজ্ঞ হোক, কিংবা কাশ্মীর ও বার্মার নির্যাতনের ইতিহাস, আফগানিস্তানে লাখো প্রাণহানি হোক অথবা শামে মুসলিম কন্যাদের উপর অবর্ণনীয় জুলুম—এসব অন্যায়-অত্যাচার এড়িয়ে গিয়ে বরং নারীদের বেপর্দা করার প্রচারণা চালানো কিংবা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী ﷺ এর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারীদের পক্ষে সমর্থন করাই

প্রকৃত মানবতা! তাদের কাছে মানবতা মানেই হলো মানুষকে আখিরাতের চিন্তা থেকে সরিয়ে দিয়ে লোভ ও কামনার দাসে পরিণত করা। অথচ দুঃখজনক হলো—তারা এই সবকেই সত্যবাদিতা এবং কখনও কখনও আল্লাহর প্রিয় কাজ বলে মনে করে। আহা, কী করুণ তাদের বুদ্ধি, কী দুর্বল তাদের চিন্তাধারা! এভাবেই উম্মতের শক্তি আজ নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়ায় নিঃশেষ হচ্ছে। গৌণ মতভেদকে জীবনের উদ্দেশ্য বানানোর ফলে তাগুতের মোকাবেলায় দাঁড়ানোর প্রশ্নে যে অপরাধমূলক অবহেলা করা হচ্ছে—সেটাকেই তারা ধর্মপরায়ণতা ভেবে বসেছে।

ধর্ম একমাত্র ক্ষেত্র নয় যেখানে উম্মত নিজেদের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত। বরং আজকের মুসলমান কাফেরদের টানা সীমারেখার বন্দী হয়ে পড়েছে—যার কারণে সে নিজের মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণকে ভুলে গেছে, শুধু এই কারণে যে, ভাইটি ঐ সীমান্তের অপর প্রান্তে অবস্থান করছে। দেশপ্রেমের মূর্তিকে আশ্রয় করে কখনও নিজ দেশের সেনাবাহিনী দিয়ে শরীয়তকামীদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে, আবার একইভাবে মদীনার ভ্রাতৃত্বের উত্তরাধিকারীদেরকেও বিশ্বব্যাপী বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে, তাদের মধ্যে ফাটল ধরানো হয়েছে। আজকের মুসলমান তাকওয়ার ভিত্তিতে নয়, বরং কৃত্রিম জাতীয় সীমারেখার ভিত্তিতে অন্য মুসলমানের প্রতি তার ভালোবাসা ও আন্তরিকতার ভিত্তি স্থাপন করছে। বিভাজনের কোনো সুযোগ হাতছাড়া করা হয় না। ভাষার ভিন্নতাকেও শত্রুতা ও ঘৃণার অজুহাত বানানো হয়েছে। অথচ সেই জাতি, যারা আরব-অজম, ফার্সি-তুর্কি কিংবা খোরাসানি জাতিগত বিভাজনের বদলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—এর পতাকার নিচে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বীরত্ব দেখিয়েছিল, তারাই আজ "বুনিয়ান মারসুস" (এক সুদৃঢ় প্রাচীর) এর সত্যিকারের অর্থ থেকে অজ্ঞ হয়ে

পড়েছে। বরং তারা তাকেও 'জাতীয়তাবাদ' এর ইসলামী পোশাক পরিয়ে ব্যবহার করছে।

কেউ কেউ আবার এই ভ্রান্ত দর্শনে স্বস্তি খুঁজে নিচ্ছে যে, কেবল ব্যক্তিগত ইবাদাতই পুরো দ্বীন, আর কাফেরদের আধিপত্যের মোকাবেলায় আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ এটা ওই জাতির মানসিক অবক্ষয়ের চরম রূপ, যে জাতির পূর্বপুরুষরা দিগন্তজোড়া পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা উড়িয়েছিল।

কোনো মুসলমান কি খেলাধুলাকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য বানাতে পারে? অথচ আজ 'দেশের নাম উজ্জ্বল করার' ছদ্মবেশে এটিকে বৈধ ও কাম্য করে তোলা হয়েছে। এমনকি সংগীতকেও পেশা বানিয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়, আর তাতে পুরস্কার পাওয়া বা সাফল্য অর্জনকেই বড় কৃতিত্ব হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে।

ধর্মীয় দলগুলোতেও একই অবস্থা—তারা কোনো একটি হুকুমকে গোটা দ্বীন বানিয়ে বাকি বিধানগুলোকে গৌণ করে তুলছে। ফলে বিশ্ব রাজনীতির দাবার কোর্টে কাফেররা কী চাল দিচ্ছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রয়ে গেছে অধিকাংশ ধর্মীয় সংগঠন। তাদের নেতা-কর্মীদের অবস্থা এমন যে, তারা একে অপরকে নিচে নামানোর প্রতিযোগিতায় এতটাই মগ্ন যেন এর চেয়ে বড় দায়িত্ব তাদের কারও উপর নেই।

এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও যত গবেষণা বা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হয়, তার সব রেকর্ড এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এমন এক সিস্টেম দাঁড় করানো হয়েছে যে, হাজার বছরও যদি এই পথে চলা হয়, তবু পথপ্রদর্শক পশ্চিমই থাকবে—কারণ তারা

বিভ্রান্তির লাগাম হাতে নিয়েছে। ফলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই রাখা হয়নি।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সেনাবাহিনী আসলে জাতীয়তাবাদী স্লোগানে গড়ে ওঠা সেই বাহিনী, যারা ধর্মের প্রকৃত অর্থ ও ইসলামের স্বার্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে সীমারেখার রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। অথবা তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় আল্লাহর দ্বীনের জন্য উঠা প্রতিটি কণ্ঠকে নৃশংসতা ও নির্মমতায় দমন করার। সাধারণ মানুষকে কখনও অজানায় রেখে, আবার কখনও প্রকাশ্যেই—যেভাবেই হোক না কেন—তাদেরকে এমন শাসকদের দাসে পরিণত করা হয়, যারা নিজেরাই তাগুতী শক্তির দাস। কিন্তু এই সেনাবাহিনী বা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরের ব্যক্তিরা কখনও নিজেদের এই কাজকে শয়তানের সেবা মনে করে না। বরং সরকারি খতীব ও ওয়ায়েজদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী একে তারা শ্রেষ্ঠ ইবাদত ভেবে বসে। অভাগা আরেকটি গোষ্ঠী আছে—যারা দ্বীনের খেদমতের তাগিদ রাখে এবং নামায-রোযাতেও অটল থাকে। কিন্তু তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ ও আবেগকে সঠিক পথে চালিত করার সৌভাগ্য জোটে না। বরং তাদের শক্তিও শেষ পর্যন্ত কাফেরদের স্বার্থেই ব্যয় হয়। যেমন আজকের খারেজী ধারা—যাদেরকে কাফেররা বিশ্বজুড়ে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের আবেগ যেন চোখের উপর বাঁধা একটি পট্টির মতো; অন্যায় হত্যার নিষেধাজ্ঞা তাদের অন্তর থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। তারা বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে মুসলমানদের ওপরই কুফরের ফতোয়া জারি করছে, অথচ কাফেরদের এড়িয়ে যাচ্ছে। এমনকি তারা মুসলিম আলেমদের হত্যার পেছনেও লেগে থাকে। কিছু তরুণকে তো বিভিন্ন সংস্থা হাতিয়ে নিয়ে ধর্মের নামে তাদের

দ্বারা নিজেদের প্রতিপক্ষকে হত্যা করায়, আর শেষে সমস্ত দোষ চাপানো হয় দ্বীন ও জিহাদের ঘাড়ে।

এমন পরিস্থিতিতে উম্মতের মৌলিক প্রয়োজন হলো রাজনৈতিক চেতনা। যেন উম্মতের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। একজন মুসলমান যেন জানতে পারে—তার লক্ষ্য কী হওয়া উচিত। তাকে কোনো আড়ম্বরপূর্ণ শিরোনামের পেছনে ছুটে না গিয়ে, বরং সত্য তথ্য, জ্ঞান ও চরিত্রের ভিত্তিতে নিজের পথ নির্ধারণ করতে হবে। তবুও আলহামদুলিল্লাহ—দুনিয়া কল্যাণহীন নয়। কেউ যদি আন্তরিক নিয়তে আল্লাহর দরবারে হেদায়াত চায়, আল্লাহ তাকে নিশ্চয়ই হকপন্থী কাতারে শামিল করবেন। আজও পৃথিবীর বহু প্রান্তে মুজাহিদগণ কুফরের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত।

বর্তমানে আমেরিকাই হলো বৈশ্বিক কুফরের নেতা। তার স্বার্থ আজ পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত। মুসলমানের করণীয়—এসব স্বার্থকে বুঝে সেগুলোর বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়া। পাশাপাশি সমাজে কল্যাণ ছড়িয়ে দেওয়া, অশ্লীলতার রোধ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা। এটাই সঠিক পথ, যে পথ সরাসরি জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মুমিনের জন্য হতাশা কখনোই মানানসই নয়। পরিস্থিতি কঠিন হলেও এ কষ্টই দ্বিগুণ সওয়াবের মাধ্যম। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা—এই স্পষ্ট লক্ষ্যকে যদি জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বানানো যায়, তবে বহু ফিতনা ও বিভ্রান্তি থেকে মানুষ রক্ষা পাবে। কিন্তু শুধু দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা যথেষ্ট নয়; বাস্তবতা উপলব্ধি করে সর্বক্ষণ আল্লাহর শরণাপন্ন হওয়াই হলো সঠিক পথ বেছে নেওয়ার মূল সূত্র। আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহকে সাহায্য করুন, হকের পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

# হালকায়ে মুজাহিদ

# নতুন সাথিদের জন্য হিজরত ও জিহাদের প্রস্তুতি

**—আব্বাস জান**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নতুন আগত মুজাহিদ সাথিদের জন্য কিছু জরুরি বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলো। যারা হিজরত ও জিহাদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসতে চান, তারা যদি আগেভাগেই এই বিষয়গুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেন, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য হিজরত ও জিহাদের পথ সহজ করে দেবেন। বিশেষত শহরাঞ্চলে অবস্থানরত দায়িত্বশীল সাথিদের অনুরোধ, যেসব ভাইকে হিজরত ও জিহাদের জন্য পাঠানো হবে, তাদের আগে ভালোভাবে প্রস্তুত করে পাঠান। যাতে করে পরে ময়দানে তাদের নিজেরও সুবিধা হয় এবং অন্য সাথিদের জন্য কোনো ঝামেলা বা বিপদের কারণ না হয়।

বেশিরভাগ বিষয়ই আমি নিজে হিজরত করার পর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুধাবন করেছি। আবার কিছু বিষয় আমার ভেতর আগে থেকেই ছিল, যার কারণে নানা ক্ষেত্রে সহজ হয়েছে। আল্লাহ আমাদের জন্য এই মহৎ জিহাদের পথ সহজ করে দিন এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থন দ্বারা আমাদের শক্তিশালী করুন—আমীন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

"আর যদি তারা বের হতে চাইত তবে অবশ্যই তারা সে জন্য প্রস্তুতির ব্যবস্থা করত, কিন্তু তাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্ অপছন্দ করলেন। কাজেই তিনি তাদেরকে অলসতার মাধ্যমে বিরত রাখেন এবং তাদেরকে বলা হল, যারা বসে আছে তাদের সাথে বসে থাক।"(সূরা আত-তাওবা ০৯:৪২)

অতএব প্রতিদিন শরীরচর্চা অভ্যাসে পরিণত করুন এবং শরীরকে শক্তিশালী করার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"আর তোমরা তাদের মোকাবেলায় যতটা সম্ভব শক্তি ও অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যার দ্বারা আল্লাহর শত্রু, তোমাদের শত্রু এবং এদের বাইরে আরও যাদেরকে তোমরা চেনো না, কিন্তু আল্লাহ জানেন—তাদেরকে তোমরা ভয়ভীতিগ্রস্ত করতে পারবে। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তা তোমাদের পূর্ণরূপে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না।" [সূরা আল-আনফাল ০৮:৬০]

## কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশনা:

- ✓ নিজের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
- ✓ নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীরকে শক্তিশালী করুন।

- ✓ ধৈর্য ও সহনশীলতা বৃদ্ধির অনুশীলন করুন।
- ✓ সুযোগ পেলে মার্শাল আর্ট যেমন কারাতে, বক্সিং ইত্যাদি শিখুন।
- ✓ কুরআনের তাফসীর অধ্যয়ন করুন এবং হাদীসের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলুন।
- ✓ কুরআনের অন্তত কিছু অংশ মুখস্থ করুন।
- ✓ সমস্ত মাসনূন দোয়া ও যিকর মুখস্থ রাখুন।
- ✓ আমীরের আনুগত্য সম্পর্কিত শরঈ জ্ঞান অর্জন করুন এবং তা বাস্তবায়নের দৃঢ় নিয়ত করুন।
- ✓ নিজেকে পরিস্থিতি অনুযায়ী গড়ে তোলার অভ্যাস করুন।
- ✓ সব ধরনের খাবার খেতে অভ্যস্ত হোন।
- ✓ ক্ষুধায় ধৈর্য ধরতে শিখুন।
- ✓ খাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর শোকর আদায় করুন, খাবার পছন্দের হোক কিংবা না হোক।
- ✓ যেকোনো অবস্থায় ঘুমানোর অভ্যাস তৈরি করুন।
- ✓ কঠিন পরিস্থিতিতে অল্প পানি কিংবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও অযু, গোসল ও পবিত্রতা রক্ষা করা শিখুন।
- ✓ বিলাসিতা ও আরামের বাইরে বাঁচতে শিখুন।
- ✓ সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আচার-আচরণ গড়ে তুলুন।
- ✓ মুসলমান ভাইদের প্রতি কোমল ও ক্ষমাশীল হোন।
- ✓ দানশীলতার অভ্যাস গড়ে তুলুন।
- ✓ ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতার মানসিকতা অর্জন করুন।
- ✓ অহংকার ও আত্মগরিমা দূর করুন, নিজের মতামত ত্যাগ করতে শিখুন।

- ✓ বিনয়ী ও নম্র হোন।
- ✓ সর্বদা যেকোনো সেবার জন্য প্রস্তুত থাকুন।
- ✓ হৃদয়কে প্রশস্ত করুন, বড় মনের অধিকারী হোন। এই ময়দানে ধৈর্য ও সহনশীলতা অপরিহার্য।
- ✓ সাথিদের ভুল ও বিরক্তিকর আচরণ উপেক্ষা করুন এবং তাদের ভালো দিকগুলোকে স্বীকৃতি দিন।
- ✓ মুজাহিদ ভাইদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখুন এবং সুযোগ পেলে তাদের উপহার দিন।
- ✓ আমীরগণের বক্তৃতা ও দারস, বিশেষ করে শহীদ মাওলানা আসিম উমর রহিমাহুল্লাহ ও উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ-এর অডিও-ভিডিও মনোযোগসহ শুনুন ও আত্মস্থ করুন।
- ✓ হিজরত সম্পর্কে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখুন। নিজের ইচ্ছার খবর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা বন্ধুকেও জানাবেন না, যাতে নিরাপত্তা বজায় থাকে। প্রয়োজনে যদি দাওয়াতি বা অন্য কারণে ময়দান থেকে ফিরে আসতে হয়, তবে বিপদের আশঙ্কা যেন না থাকে।
- ✓ সব রকম পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার কৌশল শিখুন—যেমন সাঁতার কাটা, দুর্গম পাহাড়ে ক্যাম্পিং, খাড়া পর্বতে আরোহণ, প্রবল বর্ষণে ছাউনি ছাড়া অবস্থান ইত্যাদি।
- ✓ কোনো না কোনো কারিগরি দক্ষতা অর্জন করুন—যেমন প্রাথমিক চিকিৎসা, কাপড় ও জুতা মেরামত, গাড়ি বা মোটরসাইকেলের চাকা পাংচার হলে প্রাথমিক সারাই করা।

- ✓ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিন এবং ব্যবহার শিখুন।

সবশেষে, শহীদ উস্তাদ আহমদ ফারুক রহিমাহুল্লাহ-এর 'জিহাদের গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলি' দারসের সূচনায় উল্লিখিত হাদীসের পাঠ ও অনুবাদ পেশ করছি—

"যুদ্ধ দুই ধরনের, আর যোদ্ধাও দুই শ্রেণির। যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আমীরের আনুগত্য করে, উত্তম সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, সাথিদের জন্য সহজীকরণ করে এবং ভূমিতে ফাসাদ এড়িয়ে চলে—তার ঘুম ও জাগরণ সবই সাওয়াব। আর যে গৌরবের জন্য, লোক দেখানোর জন্য বা নাম প্রচারের জন্য লড়ে, আমীরের অবাধ্য হয় এবং পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়ায়—সে কখনোই নেকীর মূলধন নিয়ে ফিরে আসে না, বরং শূন্য হাতে ফেরে।" (সহীহুল জামে)

আল্লাহ তাআলা আমাদের এসব বিষয়ে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমাকে এবং সকল আনসার ও মুজাহিদ ভাইকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন।

جزاكم الله خيراً كثيراً

# সামরিক প্রশিক্ষণ

# নিরাপত্তা (সিকিউরিটি) | দ্বিতীয় পর্ব

**—শায়খ সাইফ আল-আদল হাফিযাহুল্লাহ**

## নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে সাহাবীদের গোপনীয়তা রক্ষার প্রশিক্ষণ

এই বিষয়ে অসংখ্য হাদীস পাওয়া যায়, যা সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য এবং বিশেষভাবে মুজাহিদদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ কিছু বাস্তব উদাহরণ পেশ করছি, যা নবী ﷺ-এর গাযওয়াত ও সারিয়া থেকে চয়নকৃত। উদ্দেশ্য হলো, মুজাহিদরা (আল্লাহ তাদের হেফাযত করুন) যেন বুঝতে পারেন—আল্লাহর রাসূল ﷺ কিভাবে সামরিক কর্মকাণ্ডে গোপনীয়তার প্রতি কঠোর গুরুত্ব দিতেন। নিশ্চয়ই এতে কর্মশীলদের জন্য উপদেশ নিহিত আছে।

বেশিরভাগ যুদ্ধে নবী ﷺ গোপনীয়তার প্রতি এতটা যত্ন নিতেন যে, তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাহাবীরাও অগ্রিম কিছু জানতেন না। কেবল গাযওয়ায়ে তাবুক ব্যতিক্রম, কারণ সেটি ছিল দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য অভিযান, যার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি ও রসদের প্রয়োজন ছিল। আবার গাযওয়ায়ে খন্দকের ব্যাপারে নবী ﷺ মক্কার গুপ্তচরদের মাধ্যমে আগেই মুশরিকদের পরিকল্পনা জেনে নিয়েছিলেন। তখন মুসলমানরা মদীনার চারপাশে খন্দক খনন করলেন। মুশরিকরা এসে নতুন এই কৌশল দেখে হতবাক হয়ে বলল, "আল্লাহর কসম! এমন কৌশল তো আরবদের রীতি নয়!" এই ঘটনা প্রমাণ করে নবী ﷺ-এর সফল গোয়েন্দা কৌশলের বিষয়টা—যেখানে তিনি

শত্রুর পরিকল্পনা আগেভাগেই জেনে নিলেন এবং সেই খবর গোপন রেখে সাহাবাদেরও গোপনীয়তার শিক্ষা দিলেন। অথচ খন্দক খননেই কেটে গেছে কুড়ি দিন, যথেষ্ট সময় ছিল ইহুদী ও কুরাইশদের পক্ষে খবরটি জেনে ফেলার! হিজরতের দ্বিতীয় বছরেই নবী ﷺ 'গোপনীয়তার' নীতি বাস্তবে প্রয়োগ শুরু করেন। বদরের ময়দানের কাছে পৌঁছালে তিনি সাহাবাদের নির্দেশ দেন— "তোমাদের উটের গলায় বাঁধা ঘণ্টাধ্বনি কেটে দাও, যাতে শব্দ শুনে কেউ চিনতে না পারে।"

একবার নবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ আসদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে বারো জন মুহাজিরকে পাঠালেন গোয়েন্দা অভিযানে। তাদের হাতে তিনি একটি সিলমোহরকৃত চিঠি দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন, "দুই দিন পথ চলার আগে এটি খোলা যাবে না।"

নির্ধারিত সময়ে যখন তারা খুলল, তাতে লেখা ছিল: "আমার এ চিঠি পেলে সোজা নাখলা পর্যন্ত চলে যেও (এটি মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি একটি স্থান), সেখানে অবস্থান করে কুরাইশদের খবর সংগ্রহ করো।"

আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাহাবাদের সামনে চিঠি পড়ে শোনালেন এবং বললেন—রাসূল ﷺ কাউকে বাধ্য করেননি, চাইলে যে কেউ ফিরে যেতে পারে। কিন্তু এক জনও পিছু হটল না; সকলে দৃঢ় সংকল্পে অভিযানে অংশ নিল।

এখানেই আমাদের জন্য শিক্ষা—আমাদের সামরিক ও বিশেষত জিহাদি কার্যক্রম কি একই রকম দৃঢ়তা ও গোপনীয়তার সঙ্গে সম্পাদিত হয়, যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) করেছিলেন?

উত্তর মুজাহিদ ভাইদের উপর ছেড়ে দিলাম। নবী ﷺ সর্বদা চিঠি ও বার্তার গোপনীয়তার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিতেন, যেন শত্রুরা মুসলমানদের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে। এজন্য তিনি বন্ধু ও শত্রু উভয়ের কাছেই নিজের প্রকৃত অভিপ্রায় গোপন রাখতেন। বলা যায়, মুসলমানরাই সূক্ষ্মভাবে গোপনীয়তার কৌশল ব্যবহার বিশ্ববাসীকে শিখিয়েছিলেন, যা জার্মানরা অনেক পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯৩৯–১৯৪৫) প্রয়োগ করে[60]

বনি আসাদের বিরুদ্ধে অভিযানে নবী ﷺ সাহাবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন—রাতে চলতে এবং দিনে লুকিয়ে থাকতে; সাধারণ রাস্তাও ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে আকস্মিক আক্রমণে শত্রুরা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং মুসলমানরা প্রচুর গনীমত লাভ করে। একই কৌশল গাযওয়ায়ে দৌমাতুল জান্দালেও ব্যবহৃত হয়, যার ফলে মুসলমানরা বিজয় অর্জন করে।

গাযওয়ায়ে আহযাব (খন্দক)-এ নুআইম ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণ করলেন, কিন্তু নবী ﷺ তাকে গোপন রাখতে বললেন। তিনি আদেশ দিলেন—"তুমি একাই শত্রুদের বিভ্রান্ত করো, কারণ যুদ্ধ হলো কৌশল ও ধোঁকাবাজি।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোপনীয়তার অন্যতম দিক ছিল এই যে, যখনই তিনি কোনো যুদ্ধাভিযানের সংকল্প করতেন, তখন অন্য কোনো উদ্দেশ্যের কথা

[60] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি চিঠিপত্র ও বার্তার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এনিগমা মেশিন ব্যবহার করেছিল। এটি ছিল জটিল এনক্রিপশন যন্ত্র, যা বার্তাকে গোপন সংকেতে রূপান্তর করত। সে সময় এটিকে সর্বাধুনিক গোপন কোড প্রযুক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো এবং জার্মান সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এটি ব্যবহার করত।

প্রকাশ করতেন, যাতে শত্রুপক্ষ আসল পরিকল্পনা বুঝতে না পারে। যেমন, গাযওয়ায়ে বনি লিহইয়ানের সময় হুজুর ﷺ প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে তার লক্ষ্য শামের দিকে যাত্রা। কিন্তু বাস্তবে তিনি হঠাৎ দক্ষিণমুখী হলেন এবং শত্রুপক্ষকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আঘাত করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিলহজ, মুহাররম, সফর এবং রবিউল আউয়ালের দুই মাস (রবিউল আউয়াল ও রবিউস্ সানি)-এ মদীনায় অবস্থান করেছিলেন। পরে জুমাদাল উলায় (বনি কুরাইযার বিজয়ের ছয় মাস পর) রাসূলুল্লাহ ﷺ বনি লিহইয়ানের দিকে অভিযানে রওনা হলেন। সেখানে তিনি 'আসহাবে রজীঈ'—খুবাইব ইবনে আদি এবং তাঁর সঙ্গীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) শহীদ হওয়ার ঘটনা স্মরণ করে তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তখন নবীজী ﷺ বাহিনীকে এমনভাবে চলালেন যেন বোঝানো হয় যে, তাঁর গন্তব্য শাম (সিরিয়া) অভিমুখে। উদ্দেশ্য ছিল শত্রুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করা। প্রিয় নবীজী ﷺ মদীনা থেকে বের হয়ে 'ঘুরাব' নামক একটি পাহাড়ের পথ ধরলেন (এটি শামের পথে অবস্থিত)। তারপর 'মুহাইস' অঞ্চলে, পরে 'বুতরার' দিকে, এরপর 'সাফক' অঞ্চলে গেলেন। সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাম দিকে ঘুরে মদীনার কাছের এক উপত্যকার দিকে অগ্রসর হলেন, পরে ইয়ামামের টিলার দিকে গিয়ে অবশেষে মক্কার পথে গমন করলেন। সেখানে পৌঁছে 'গুরান' নামক স্থানে অবস্থান করলেন, যা বনি লিহইয়ানের এলাকা।

একইভাবে 'ফাতহে মক্কা' ছিল এক বিরাট অভিযাত্রা। এমনকি মুমিনদের মা, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কেও এ পরিকল্পনার কথা জানানো হয়নি। পরে যখন রাসূল ﷺ সবাইকে সংবাদ দিলেন যে

অভিযাত্রার লক্ষ্য কুরাইশদের মোকাবিলা করা, তখনই সমগ্র সেনাদল যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করল।

এভাবেই হযরত আবু লুবাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘটনায়ও শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। যখন তিনি বনি কুরাইযার নিকট গিয়েছিলেন যাতে তারা রাসূল ﷺ -এর রায়ে রাজি হয়, তখন তিনি অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন। এর ফলে তাঁর শাস্তির কথা উল্লেখ এসেছে, আর গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং তা প্রকাশ না করার গুরুত্বের প্রতি নির্দেশ এসেছে। এ বিষয়েই আল্লাহ তাআলা বিশেষ কিছু আয়াত নাযিল করেছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো না, আর তোমাদের আমানতের ব্যাপারেও ইচ্ছাকৃতভাবে খিয়ানত করো না। [সূরা আল-আনফাল ০৮:২৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ ও ইবনে শিহাবুয্-যুহরী বলেন: এই আয়াত নাযিল হয়েছিল আবু লুবাবাহ ইবনে মুনযির রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ব্যাপারে। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বনি কুরাইযার নিকট পাঠালেন, যাতে তিনি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ তাদের উপর কার্যকর করেন। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পরামর্শ চাইল। আবু লুবাবাহ তাঁদের গলা কেটে ফেলার ইঙ্গিত দিয়ে নিজের হাত গলায় রাখলেন। তখনই তিনি বুঝলেন— এটা আসলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে এক প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে গেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে শপথ করলেন: "আমি আর কিছুই (কোনো খাবারের) স্বাদ গ্রহণ করব না, মৃত্যু এসে আমাকে গ্রাস করা পর্যন্ত কিংবা আল্লাহ আমার তাওবা কবুল না করা পর্যন্ত।" এরপর তিনি মসজিদে এসে

নিজেকে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলেন। এভাবে তিনি টানা নয় দিন থাকলেন। নবম দিনে অনাহারে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন। সাহাবারা তাঁকে শুভ সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেছেন। তাঁরা তাঁর বাঁধন খুলে দিতে চাইলে তিনি বললেন, "এটা আমি শপথ করেছি—আমার বাঁধন শুধু আল্লাহর রাসূলই খুলবেন।"

পরে রাসূল ﷺ এসে নিজ হাতে তাঁকে মুক্ত করলেন। এরপর তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমি মানত করেছি, আমার সব সম্পদ দান করে দেবো।"

রাসূল ﷺ বললেন: "তুমি তার সবটুকু দান করবে না, কিছু অংশ দান করাই তোমার জন্য যথেষ্ট।"[61]

এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাতের কিছু দৃষ্টান্ত মাত্র। তাঁর জীবন বৃত্তান্তে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যা গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব ও তা প্রকাশ না করার অপরিহার্যতার সাক্ষ্য বহন করে।

## রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোলাফায়ে রাশেদীনের শিক্ষা:

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের সেনাপতিদের সর্বদা গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে উপদেশ দিতেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো:

[61] তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩৩

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উপদেশ, যা তিনি ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফইয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে শামের অভিযানে পাঠানোর সময় দিয়েছিলেন। তাঁর মহান সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে রিদ্দাহ যুদ্ধের ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উপদেশ, আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উপদেশ, যা তিনি সাঈদ ইবনে আবি ওক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে দিয়েছিলেন। এগুলো সবই গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্বে পরিপূর্ণ।

## উপদেশ:

হে আমার মুজাহিদ ভাই! যুদ্ধের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষায় সতর্ক থেকো। কারণ এর মাধ্যমেই, আল্লাহর ইচ্ছায়, তোমার পরিকল্পনা সফল হবে এবং তুমি শত্রুর কৌশল ভণ্ডুল করতে পারবে। নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, এমন কোনো কথায় তা খুলে দিও না যাতে তোমার গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। মনে রেখো, কখনো কখনো মধুর বাচনেই গোপন দুর্গ ভেঙে যায়। ছোট কারণে বা অপরিচিত কারও সামনে অসতর্কতার কারণে গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যায়, আর শত্রু তা জেনে ছড়িয়ে দেয়। ইমামুল মুজাহিদিন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন "নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো। কারণ জিহ্বা মানুষকে দ্রুত ধ্বংসে ঠেলে দেয়। এই জিহ্বাই মানুষের হৃদয় ঘুরিয়ে দেয়, আবার মানুষকে প্রজ্ঞার পথও দেখায়।"

যেমন বলা হয়:

قلوب الابرار قبور الاسرار

— সৎ মানুষের হৃদয় রহস্যের কবরস্থান হয়; আবার বলা হয়, "মূর্খের হৃদয় তার মুখে আর জ্ঞানীর জিহ্বা তার হৃদয়ে থাকে"; কারও কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি কিভাবে গোপন রাখো? সে বলল: "আমি গোপনকে লুকাই এবং এটাও লুকাই যে কোথায় লুকাই", তাই হে আমার মুজাহিদ ভাই! তোমার জন্য আবশ্যক তোমার জামাতের গোপন তথ্য ও কর্মসমূহ ঢেকে রাখা এবং তা কখনো প্রকাশ না করা, কেননা কাফেরদের কাছে মুমিনদের গোপন তথ্য দেওয়া হারাম;

আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

"মুমিনরা মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদের বন্ধু ও সাহায্যকারী বানাবে না; যে এমন করবে তার আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক থাকবে না" (আলে ইমরান ০৩:২৮) ;

জ্ঞানীদের কেউ বলেছেন:

كفىٰ بالمرء خيانة ان يكون امينا للخونة

"কোনো বিশ্বাসঘাতকের আমানত রক্ষা করাই যথেষ্ট বড় বিশ্বাসঘাতকতা।"

তাঁরা আরো বলেন:

سرك من دمك

"তোমার গোপন তোমার রক্তের সমান মূল্যবান;"

এ প্রসঙ্গ আমি শেষ করছি মাহমুদ শীত খাত্তাবের উক্তি দিয়ে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইচ্ছা আড়াল করতেন, এমনকি কাছের লোকদের

থেকেও। চলার সময় গোপনীয়তার পূর্ণ যত্ন নিতেন—হোক তা সেনাদলের বিন্যাস, অস্ত্রশস্ত্র কিংবা সৈন্য সংখ্যা; আর এটাই ছিল তাঁর বিজয়ের প্রকৃষ্ট কারণ”[62]

সুতরাং গোপন রাখা বিজয়ের অন্যতম প্রধান উপায়, আর গোপনীয়তা ফাঁস করা পরাজয়ের কারণ; তাই আমি নিজেকে এবং আমার মুজাহিদ ভাইদের উপদেশ দিচ্ছি গোপন বিষয় ছড়িয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন না করতে এবং অন্যকে বিপদে না ফেলতে; কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন:

مِنْ حُسنِ إسلامِ المرءِ تَرْكُه ما لا يَعْنِيه

মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হলো, যে বিষয় তার জন্য জরুরি নয় তা ছেড়ে দেওয়া”[63]; তবে এসব বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে মুজাহিদ ভাইয়েরা গুপ্তচর বা সন্দেহভাজন, বরং যে কেউ সাহাবাদের পথ অনুসরণ করতে চায় তার উচিত এসব গোপনীয়তার আদব মানা, হয়তো সে এ বিষয়ে অজ্ঞ—সেক্ষেত্রে আমাদের এই আলোচনা তার জন্য উপকারী হয়ে উঠবে।

**চলবে ইনশাআল্লাহ....**

## ম্যাগাজিন সমাপ্ত

[62] দুরুস ফিল-কিতমান

[63] মিশকাত শরীফ, খণ্ড ৪, হাদীস ৭৭৭